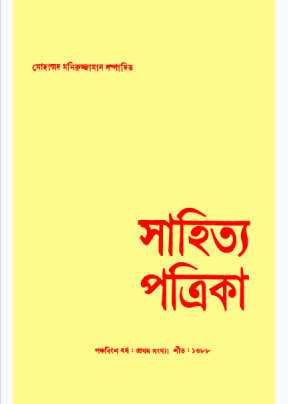

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সন্দেশ-রাসক [আবদুর রহমান বিরচিত]

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.1
Pages	1-26
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সন্দেশ-রাসক

[আবদুর রহমান বিরচিত]

সৈয়দ আলী আহসান

ভূমিকা

হিন্দীতে 'রাস', 'রাসো' এবং 'রাসক' এ-শব্দ তিনটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় বিশেষ ধরনের কাব্যের ব্যাখ্যা-সূত্রে। কারও কারও ধারণা যে বীররস-প্রধান কাব্যেই হচ্ছে 'রাসো' কাব্য এবং বীররসেতর কাব্য হচ্ছে 'রাস'।[১] তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত, ভারতীয় সাহিত্যে এ-ধরনের কাব্যকলার পরিচয় প্রাচীনকাল থেকেই আছে। 'হরিবংশ পুরাণে' অস্পষ্টভাবে এবং 'বিষ্ণুপুরাণে' স্পষ্টভাবে 'রাস' কাব্যের উল্লেখ আছে গোপালদের নৃত্যব্যাখ্যায়।[২] ভাসের 'বালচরিত' নাটকে গোপাল এবং গোপিকাদের সম্মিলিত ক্রীড়ার বর্ণনা পাই। তখন সম্ভবতঃ 'রাস' শারীরিক গতিব্যঞ্জনার লোকনৃত্য ছিলো। *Types of Sanskrit Drama* গ্রন্থে D. R. Mankad লিখেছেন : "রাস is thus not to be derived from রস but from রাস্ a mood which means to cry aloud, which may refer to be very primitive form of dance when the proportion of music and artistic movemets may not have been still realistic and when it must have been practised as wild dance."[৩] অর্থাৎ "রাসে'র ব্যুৎপত্তি 'রাস্' ধাতু থেকে হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে উচচরোলে চিৎকার করা। আদিম যুগের নৃত্যের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ছিলো যখন সঙ্গীতের মাত্রা এবং কলাত্মক গতি ব্যবস্থিত হয়নি। সে-সময় সম্ভবতঃ বন্য নৃত্য রূপে এর প্রচলন হয়েছিলো।" 'হর্ষচরিতে' 'রাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে 'রাস' এসেছে সঙ্গীত সংযোজনায়। অবশ্য বাণভট্ট 'অশ্লীল রাসক পদানি' নামক এক প্রকার গানের উল্লেখও করেছেন যে-গান নারীকণ্ঠে গীত হত। 'রাস' নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের প্রচলনের উল্লেখ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও পাওয়া যায়—একটি শ্লোকে ধ্রুপদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৪]

ক্রমানুয়ে 'রাস' বা 'রাসক' জনসমাজে বহুবিধ রূপে প্রকাশ পেতে লাগলো। জন-তার প্রসন্নতার জন্য জৈন মন্দিরেও একসময় 'রাসে'র প্রচলন হয়েছিলো। একাদশ শতাব্দীতে 'রাস' প্রধানতঃ সঙ্গীতরূপে উপস্থাপিত হতে লাগলো। উত্তর ভারতে এগুলো কখনও কখনও 'চর্চরী' নামেও অভিহিত হয়েছে। 'কর্পূরমঞ্জরী'তে 'দণ্ডরাস', 'তালারাস্ত' এবং আরও কয়েক প্রকার রাস-চর্চার উল্লেখ আছে।[৫] ভারতে এ-সময় গোয়ালীয়রের বাগগুহায় 'লগুড় রাসনৃত্যে'র একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছিলো।[৬]

এভাবে যুগ-পরম্পরায় নৃত্য-রাস, নৃত্য-গীত রাস এবং শ্রব্যরাসের উৎপত্তি ঘটেছে। একাদশ শতাব্দীতে নিছক শ্রব্য-রাসের উৎপত্তি ঘটেছে বলে ডক্টর দশরথ শর্মা বলেছেন।[৭] শ্রব্য-রাস মূলতঃ প্রণয়-গীতি, বিরহিণীর আক্ষেপানুরাগ এবং বিচিত্র দুঃখদশার বর্ণনা। 'কর্পূরমঞ্জরী'তে বর্ণিত পাই তালানুগত নৃত্যের সঙ্গে নর্তকিগণ 'দণ্ডরাস' উপস্থাপনা করছে যেখানে সমবাহু, সমশীর্ষ, সমাভিমুখ নর্তকীদের দেহভঙ্গীগত মুদ্রার উল্লেখ আছে।[৮]

রাসের প্রধান রস ছিলো শৃঙ্গার। জৈন মন্দিরের রাস ছিলো উপদেশবহুল এবং শ্রব্য-মাত্র। নৃত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো না। দ্বাদশ শতকে জৈন আচার্য হেমচন্দ্র ৯ শ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্তর্গত করেছেন 'ডোম্বিকা', 'ভান', 'ভাণিকা', 'প্রস্থান', 'রামাক্রীড়' ইত্যাকার বিভিন্ন 'রাসক'কে। চতুর্দশ শতকে 'সাহিত্য দর্পণে' বিশ্বনাথ কবিরাজ ১০ 'নাট্য রাসক' এবং 'রাসক' নামক দু-প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত কাব্যের কথা বলে-ছেন, এবং উভয়ের লক্ষণের মধ্যেই অঙ্ক-নায়ক, নায়িকা সন্ধি ইত্যাদি গণনার বিষয় ছিলো। অর্থাৎ এক কথায় 'রাস' বা 'রাসক' ছিলো বহুল প্রচারিত এবং লোক-সমর্থিত এক বিশেষ ধরনের কাব্য সাধনা যা কোনও একটি যুগের সীমার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়নি, পরন্তু যুগানুক্রমে বহুদিন পর্যন্ত জীবন্ত ছিলো।

'রাস' বা 'রাসক' কাব্যে বিষয়গত সীমাবন্ধন ছিলোনা। প্রধানতঃ শৃঙ্গার এবং বিরহ এর প্রতিপাদ্য হলেও জনসাধারণের দুঃখ-সুখ, মনোরঞ্জন, ধার্মিকতা এবং বীরপূজাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'সন্দেশ রাসক' ও এরকমই একটি প্রচলিত প্রেমগাথার আধারের উপর রচিত।

কাব্যের সূত্রপাতে কবি তাঁর পরিচয়ভাষ্যে লিখেছেন—

'পচচাএসি পহুও পুব্বপসিদ্ধো য় মিচ্ছদেসোত্থি।
তহ বিসয় সম্ভূও আরদ্দো মীরসেণস্স ॥
তহ তণও কুলকমলো পাইয়কব্বেসু গীয়বিসয়েসু।
অদ্দহমাণপসিদ্ধো সন্দেহরাসয়ং রইয়ং ॥[১১] তিনটি তথ্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে—

১. কবির স্থান ছিলো 'মিচ্ছ দেশ' যা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিলো।

২. উক্ত প্রদেশে 'মীরসেন আরদ্দের পুত্র আদ্দহমাণের' জন্ম হয় যিনি প্রাকৃত কাব্য রচনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। এবং

৩. তিনি 'সন্দেশরাসক' রচনা করেন।

কোনও কোনও পুথিতে মিচ্ছদেশকে 'ম্লেচ্ছনামা দেশোস্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-'মিচ্ছ' বা ম্লেচ্ছ দেশ কোথায় তা' ঠিক করে বলা না গেলেও বর্তমানে পণ্ডিতগণ কিছুটা নিশ্চয় হয়েছেন যে, দেশটি পাকিস্তানের কোনও একটি অঞ্চলে স্থিত ছিলো। 'সন্দেশ-রাসক' কাব্যে বিজয়নগর এবং মুলতান শহরের নাম আছে। সম্ভবতঃ কবি এ-দুটো শহরের নিকটবর্তী কোনও স্থানের নিবাসী ছিলেন।

কবির পিতার নাম মীরসেন, কৌলিক কর্মে তিনি ছিলেন 'আরদ্দ'। টীকাকারগণ 'আরদ্দে'র অর্থ করেছেন তন্তুবায়। কবি স্বয়ং আপন রচনাকে 'কৌলিক পয়াসিউ' অর্থাৎ কৌলিক দ্বারা রচিত বলেছেন।

মীরসেন নামটির প্রথম অংশ মুসলমানী কিন্তু 'সেন' শব্দটি হিন্দু উপাধিবাচক, তবে 'অদ্দহমান' যে আবদুর রহমান তা বর্তমানে স্বীকৃত। কাব্য-পাঠে অনুভব করা যায়, কবি প্রাকৃত কাব্যে পূর্ণ অধিকারী ছিলেন এবং ভারতীয় সাহিত্যের পরম্পরা সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিলো। তাঁর কাব্য এতদ্দেশীয় লৌকিক কাব্য এবং সম্পূর্ণভাবে পারসিক প্রভাবমুক্ত। এ-কাব্যটি একটি অবিচল নিরঙ্কুশ উদারতায় রচিত। একজন

মুসলমান কবি হিসেবে তিনি নিরাকার ভাবনার উপাসক ছিলেন এবং 'অনায়তু অন্ত' অর্থাৎ অনাগত অন্তের (কিয়ামত) কথা বলেছেন।

আবদুর রহমানের কোনও উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায়না। সুতরাং 'সন্দেশরাসকে'র রচনাকাল নির্ধারণ পণ্ডিতগণের পক্ষে খুব সহজ হয়নি। সন্দেশরাসকে'র ভাষা এবং কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত লৌকিক কর্ম ও ভাবনা পরীক্ষা করে মুনি জিনবিজয় আবদুর রহমানকে মুহম্মদ গোরীর ভারত আক্রমণের কিঞ্চিৎ পূর্বকালের অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের কবি বলে সাব্যস্থ করেছেন।[১২]

পণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতে আবদুর রহমানের কাল ১০১০ খ্রীস্টাব্দ, দেশ মুলতান এবং কুল জুলাহা অর্থাৎ তন্তুবায়।[১৩]

'সন্দেশরাসক' কাব্যে মুলতানের যে বর্ণনা আছে তা একটি সজীব, সমৃদ্ধ নগরের। মুলতান তখন ছিলো পশ্চিমোত্তর ভারতের একটি প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান। এতে অনুমিত হয় 'সন্দেশরাসক' রচনার সময়কালে মুলতানের মুহম্মদ গোরীর আক্রমণ ঘটেনি কেননা মুহম্মদ গোরীর আক্রমণে বিধ্বংসপ্রাপ্ত মুলতান তার পূর্ব-সমৃদ্ধিকে আর কখনও ফিরে পায়নি।

'সন্দেশরাসক' একটি প্রেম-কাব্য যেখানে নায়িকার বিরহ-নিবেদনের বিচিত্র রসাস্বাদে আমরা অভিভূত হই। ভারতীয় সাহিত্যের লৌকিক প্রকল্পের শৃঙ্গারকাব্য হিসেবে 'সন্দেশরাসক' আমার কাছে অতুলনীয় মনে হয়েছে। যেমন নাগরিক বৃত্তি, তেমনি গ্রামীণ সরলতা; যেমন কাম্যের প্রসাধন, তেমনি নিবৃত্তির সহনশীলতা; যেমন বিরহের সংশয় ও নির্যাতন, তেমনি আনন্দের বৈকুণ্ঠ—সর্বপ্রকার অবস্থাকে কবি শব্দে ও ছন্দে সুচিহ্নিত করেছেন। কবি লিখছেন—

'অনুরাইয় রইহরু কামিয়মনহরু,
ময়ণ মহপ্পহ দীবয়রো।
বিরহিণিমইরদ্ধউ সুনহ বিসুদ্ধউ,
রসিয়হ রসসঞ্জীবয়রো॥'[১৪]

অর্থাৎ "'সন্দেশরাসক' অনুরাগিগণের রতিগৃহ, কামিনীকুলের মনোহরণকারী, মদনের মাহাত্ম্যপ্রকাশকারী, বিরহিণীদের জন্য মকরধ্বজ, এবং রসিকসুজনের জন্য বিশুদ্ধ রস সঞ্জীবক।" কবি আরও বলছেন, 'এর রচনা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্বক করেছি, এ-কাব্য প্রেম এবং শৃঙ্গারের ভাবনায় পরিপূর্ণ, কর্ণপুটে অমৃতময় স্বরধ্বনি এবং সুখদ। এর অর্থ এবং লক্ষণ শুধু সেই বিচক্ষণের কাছে ধরা পড়ে যিনি সুরতি-সঙ্গমে বিদগ্ধ।'

কবি আবদুর রহমান কাব্যের প্রারম্ভে বিশ্বপিতার বন্দনা করে আপন তন্তুবায়কুলের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর আপন পূর্ববর্তী সে-সমস্ত কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলী সমর্পন করেছেন যাঁরা অবহট্ট, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পৈশাচী ভাষায় কাব্যরচনা করতেন। কবি আপন অল্পজ্ঞতার কারণে তাঁর সাধারণ কৃতির জন্য বিদ্বজ্জনের ক্ষমা প্রার্থনা করে বলছেন, গঙ্গার বিপুল মহিমা থাকলেও সাধারণ নদী তার উপযোগিতা হারায়না। কবি তাঁর কাব্যকে একদিকে বিদ্বন্মণ্ডলী অপরদিকে মূর্খমণ্ডলী উভয়ের জন্য অনুপযুক্ত ভেবেছেন। তাঁর বিবেচনায় মধ্যমবর্গের পাঠকই তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন করবে। দ্বিতীয় ক্রমে কবি মূল কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছেন। বিজয়নগরে রাহুগ্রস্ত চাঁদের

মতো মুখাবয়বধারিণী এক প্রোষিত-পতিকা নায়িকা তার পতির আগমনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করে অশ্রুপাত করছিলো। বিয়োগ-সন্তপ্তা নায়িকা পথযাত্রী এক পথিককে দেখে তার গন্তব্যস্থানের নাম জিজ্ঞেস করলো। পথিক আপন পরিচয় দিয়ে বললো, আমি মূলস্থান থেকে আসছি এবং আমার প্রভুর সন্দেশ নিয়ে স্তম্ভতীর্থে যাচ্ছি। স্তম্ভ-তীর্থের নাম শুনে নায়িকা বিকম্পিত হলো, কেননা তাকে বিস্মৃত হয়ে স্তম্ভতীর্থে তার পতি অবস্থান করছে। পতিকে কোনও সংবাদ দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করায় রমণী বললো, যে হৃদয়হীন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের আশায় তার প্রিয়াকে বিস্মৃত হয় তাকে আমি কি সন্দেশ পাঠাবো।

এভাবে উভয়ের কথোপকথন চললো। নায়িকা গ্রীষ্মকাল থেকে আরম্ভ করে বসন্ত কাল পর্যন্ত আপন সম্ভাব্য বিপদ-বেদনার কথা উল্লেখ করলো।

পথিককে বিদায় দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করতেই পথে পতিকে দেখলো। সে তখন আনন্দে বিভোর হল।

সন্দেশরাসকের ভাষা পরবর্তী অপভ্রংশ। কাব্যানুশাসনে হেমচন্দ্র শিষ্ট অপভ্রংশ ছাড়া একপ্রকার গ্রামীণ অপভ্রংশের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। গ্রামীণ অপভ্রংশ জন-জীবনের অত্যন্ত নিকটে। শিষ্ট অপভ্রংশে ব্যাকরণের যে শাসন আছে এখানে তা নেই। এভাবে গ্রামীণ রূপের কারণে এবং অনেকটা ব্যাকরণ-শাসন-মুক্ততার জন্য অনেকে এ-ভাষাকে অবহট্ট নাম দিয়েছেন। সন্দেশরাসকের কবি তাঁর রচনাকে সাধারণ মানুষের গ্রহণ যোগ্যতার মধ্যে এনেছেন।[১৫]

সন্দেশ-রাসক

প্রথম প্রক্রম

হে জ্ঞানবানগণ! যিনি প্রথমে সমুদ্র, পৃথ্বী, পর্বত, বৃক্ষ এবং আকাশরূপী অঙ্গণে তারকারাজী সৃজন করেছেন তিনি তোমাদের কল্যাণ দান করুন।

হে নাগরিকবৃন্দ! সেই প্রভুকে নমস্কার কর যিনি মনুষ্য, দেবতাকুল, বিদ্যাধর এবং আকাশপ্রাঙ্গণে চলমান সূর্য, চন্দ্র দ্বারা নমস্কৃত হন।

পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে ম্লেচ্ছ দেশ আছে সেই প্রদেশে মীরসেন নাম এক তন্তুবায়ের জন্ম হল।

তাঁর পুত্র আবদুর রহমান সন্দেশ-রাসক রচনা করেন, যিনি ছিলেন আপন কুলের কমল এবং প্রাকৃতকাব্য রচনায় এবং গীত-বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ।

শব্দশাস্ত্রে[১৬] কুশল প্রাচীন বিদগ্ধজন এবং কবিগণকে আমি নমস্কার করছি যাঁদের কলাকুশলতায় ত্রিলোকে কাব্যছন্দ নির্দিষ্ট এবং নির্মিত হয়েছে যাঁরা অপভ্রংশ, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পৈশাচী ভাষায় কবিতা লিখেছেন এবং সুন্দর কাব্যকে লক্ষণ, ছন্দ এবং অলঙ্কারে বিভূষিত করেছেন।

উক্ত কবিগণের পরবর্তী আমি শ্রুতি, শব্দ, শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞান। লক্ষণ-ছন্দ-রহিত আমার কুকবিতাকে কে প্রশংসা করবে ?

তবে এবম্বিধ প্রশংসায় দোষ নেই কেননা রাত্রে চন্দ্রমা উদিত হয় বলেই গৃহে কি রাত্রির দীপক জ্বলবে না ?

তরুশিখরে বসে কোকিল সরস এবং মনোহর শব্দ করে বলেই গৃহের ছাদে বসে বায়স কি কর্কশ শব্দ করবেনা ?

কোমল করাঙ্গুলীর দ্বারা বাদিত অতি মধুর বীণাধ্বনি লোকেরা শ্রবণ করে বলেই, সাধারণ স্ত্রীলোকের ক্রীড়া-বিনোদনের ঢোলক-বাদ্য কি কেউ শুনবেনা ?[১৭]

যেহেতু মত্ত গজ দলিত কমলের উৎকট গন্ধের মতো মদক্ষরণের কারণে দুষ্প্রেক্ষ্য এবং যেহেতু সে প্রেমাসিক্তজনিত রাগে মত্ত,[১৮] তাই বলে কি অন্য গজ অনুরূপ মদমত্ত হবেনা ?

যেহেতু বহুবিধ সুগন্ধ যুক্ত নন্দনের পারিজাতবৃক্ষ ফুল্লকুসুমে শোভমানা, তাই বলে কি বিশুষ্ক তরু কুসুমিত হবে না ?

ত্রিলোকে যার প্রভাব নিত্য প্রকটিত সেই গঙ্গা যেহেতু সাগরের দিকে প্রবহমানা, তাই বলে কি অন্য নদী প্রবাহিত হবে না ?

সূর্যের উদয়ে নলিনী বিমল সরোবরে প্রস্ফুটিত হয় বলেই কি গৃহোদ্যানের লৌকী[১৯] কুসুমিত হবে না ?

ভরতমুনি কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাব এবং ছন্দকে অনুসরণ করে নবযৌবন সৌন্দর্যে আপ্লুতা তরুণী নৃত্যরতা হয় বলেই কি গ্রাম্য রমণীকুল করতালি দিয়ে নাচবে না ?

প্রচুর দুগ্ধমিশ্রিত চালের সুস্বাদু ক্ষীর রন্ধন করা হয় বলেই কি ভূসি-মিশ্রিত রাবড়ী প্রস্তুত করা যাবে না ?

যার যতটা কাব্যশক্তি আছে তার কর্তব্য হচ্ছে সে-শক্তি অনুসারেই নিঃসঙ্কোচে কাব্য রচনা করা। চতুর্মুখ[২০] কবিতা উচ্চারণ করেন বলেই কি অন্য কবিরা কাব্য রচনায় বিরত থাকবে ?

ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই যা আপনারা দর্শন করেননি অথবা যার সম্পর্কে শ্রবণ করেননি। কঠিন-বন্ধ এবং সরস সুচ্ছন্দ শ্রবণ করে, তদোতিরিক্ত আমার মতো মুর্খ রচিত লালিত্যহীন পরুষ কাব্যকে কে পছন্দ করবে ! তবুও যেমন দরিদ্র বিগদ্ধজন পাত্রের অভাবে কমল-পত্রে ভোজন করে আশ্বস্ত হন, তেমনি আমার মতো কুকবিকেও কেউ কেউ হয়তো পাঠ করবেন।

নিজস্ব কাব্যজ্ঞানের মাহাত্ম্য সৃষ্টির জন্য এবং পাণ্ডিত্য বৃদ্ধির জন্য আমি তন্তুবায় বংশে জন্মগ্রহণ[২১] করেও কৌতূহলপরবশ না হয়ে সরলভাবে এই সন্দেশ-রাসক রচনা করেছি। একথা জ্ঞাত হয়ে হে জ্ঞানবানগণ, ক্ষণকাল স্নেহবশতঃ পামরজনের স্থূল অক্ষরে রচিত এ-কাব্য শ্রবণ করুন।

যদি কোনও সমর্থ ব্যক্তির হাতে এ-পুস্তক পড়ে এবং তিনি এ গ্রন্থ পাঠ করবার চেষ্টা করেন, তবে উক্ত বিদ্বান ব্যক্তির হাত ধরে আমি অনুনয় করে বলবো, যিনি পণ্ডিত এবং মুর্খের মধ্যে ভেদ করেন তার সামনে এ-কাব্য পাঠ করবেন না।

কুকবির সঙ্গে পণ্ডিতজনের সম্পর্ক থাকেনা, এবং নির্বোধজন কাব্যক্ষেত্রে কখনও প্রবেশ করতে পারেনা। এ-কারণে যিনি মুর্খ নন এবং পণ্ডিতও নন এহেন মধ্যম কোটির লোকের সামনে সর্বদা এ-কাব্য পাঠ করবেন।

এই সন্দেশ-রাসক অনুরাগী ব্যক্তিদের রতিগৃহ, কামার্থীদের চিত্ত-হরণকারী, রতি-দেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক, বিরহিণীদের জন্য মকরধ্বজ এবং রসিকজনের জন্য বিশুদ্ধ রসসঞ্জীবক। এ-কাব্য শ্রবণ কর।

অশেষ মমতার সঙ্গে এই সন্দেশ-রাসক রচনা করা হয়েছে, এ-কাব্য প্রেম এবং শৃঙ্গারের ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং কর্ণপুটের জন্য অমৃত সরোবর অর্থাৎ অমৃতময় সুরধ্বনি। এর অর্থ এবং লক্ষণাদি সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিই লিখতে পারবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যিনি সুরতি-সঙ্গমে বিদগ্ধ।

দ্বিতীয় প্রক্রম

উত্তুঙ্গ-স্থির-স্থূল স্তন যার, ভ্রমরীর মতো যার ক্ষীণ কটি, যার গতি হংস-সদৃশ বিজয় নগরের এহেন বররমণী মলিন মুখমণ্ডলে অশ্রুপ্রবাহিত করে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলো, স্বর্ণের মতো অঙ্গ যার সেই রমণীর শরীর বিরহাগ্নিতে এতদৃশ শ্যামল হয়েছিলো যেন রাহু কর্তৃক চন্দ্রমা সম্পূর্ণ গ্রাস পেয়েছে।

'ফুসই লোয়ন রূবই দুক্খত্ত'—সে চোখ মুছছিলো এবং দুঃখে আর্ত হয়ে ক্রন্দন করছিলো। কেশবন্ধন মুক্ত হয়ে তার মুখমণ্ডল ছেয়েছিলো, সে জৃম্ভন করছিলো, মোহগ্রস্ত অঙ্গ তার, বিরহানলে সন্তপ্ত হয়ে সে তার করাঙ্গুলী ভাঙ্গছিলো। এই বিলাপকারিণী মুগ্ধা এক পথযাত্রীকে চলতে দেখলো যে এত দ্রুত বেগে চলছিলো মনে হচ্ছিলো যেন তার পদদ্বয় পৃথ্বীতল শুধুমাত্র স্পর্শ করেই শূন্যে উড়ে যাচ্ছে।

পথিককে দেখে উক্ত প্রিয়োৎকণ্ঠিতা মন্থর গতি পরিত্যাগ করে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। 'উতাবলী' বা দ্রুতগতিতে চলার কারণে চঞ্চল রমণ ভারে তার 'করধনী' বা কোমরের অলঙ্কার খুলে পড়লো এবং অলঙ্কারের কিঙ্কিনি ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

'করধনী'কে উক্ত সুভগা সুদৃঢ়ভাবে বাঁধতে না বাঁধতেই তার স্থূল মুক্তাময়ী নবীন হার-লতা ছিন্ন হল। যতক্ষণে সে কিছু তুলে কিছু ফেলে দিয়ে পুনরায় চলা আরম্ভ করেছে ততক্ষণে তার পায়ের নূপুর খসে পড়লো।

যখন উক্ত সবিলাসা, সলজ্জা এবং উৎক্ষিপ্তা বিরহিণী মাটিতে পতিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, তখন সে-মুগ্ধার শ্বেত এবং স্বচ্ছ শিরোবস্ত্র সরে গেল। শিরোবস্ত্র ঠিক করে পথিকের কাছে পৌঁছবার ইচ্ছায় যেই সে আবার অগ্রসর হয়েছে তখনই তার রেশমী চোলী ফেটে গেল এবং স্তনের কিছু কিছু অংশ দেখা যেতে লাগলো।

উক্ত লজ্জাবতী যেন-তেন প্রকারেন নিজ হাতে স্তন ঢাকলো—মনে হল যেন ইন্দীবর স্বর্ণ কলসকে আচ্ছাদিত করেছে। অবশেষে পথিকের নিকটে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘ-নয়না বিরহিনী গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বিলাসপূর্বক করুন শব্দ করলো।

তিষ্ঠ-তিষ্ঠ! হে পথিক, নিমেষার্ধ সুস্থির হয়ে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। ক্ষণ-কালের জন্য করুণা কর—'পসিজ্জি খনু'। এ বচন শুনে পথিক কৌতূহলী হল—সে সামনে অগ্রসর হলনা, পিছনেও ফিরলোনা।

কুসুমশরায়ুধ-রূপা, গরিষ্ঠা রূপনিধি এহেন সুন্দরী বিধির উৎকৃষ্ট কৃতি।[২২] একে দেখে প্রেমী পথিক অষ্টগাথা পাঠ করলো!

বিধাতার বৈদগ্ধের উপর উক্ত পথিক আরও একটি দোহা পাঠ করলো কেননা রূপ-বর্তীকে দেখে তার মনে বিস্ময় জেগেছিলো।

প্রজাপতি কি অন্ধ না অরসিক যে এ-প্রকার রমণীকে নির্মাণ করে নিজের কাছে রাখলেন না?

তার অলক অতি কুটিল, তরঙ্গিনীর সলিলকল্লোলের মতো বক্র, কালিমায় অলিকুল-মালার মতো।

রাত্রির তমসানাশকারী অমৃতস্রাবী পূর্ণচন্দ্রের মতো উক্ত রমণীর মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক-তায় সূর্যের প্রতিবিম্বসদৃশ।

দীর্ঘতর রাগযুক্ত লোচনযুগল যেন অরবিন্দদল এবং তরুণ কপোল দাড়িম্বকুসুমপুঞ্জের ভাঁতির মতো সুন্দর।

তার বাহু মানসসরোবরে উৎপন্ন কোমল মৃণালের মতো। বাহুর প্রান্তদেশের কমলসম হস্ত যেন দ্বিধাভূত পদ্ম।

স্তনদয় পরস্পর যেন স্বজন এবং প্রস্তরের মতো। স্তব্ধ, নিত্য, উন্নত এবং মুখরহিত হবার কারণে প্রস্তরের মতো এবং সঙ্গমের পর অঙ্গকে আশ্বস্ত করে বলে স্বজনের মতো।

নাভিমণ্ডল পার্বত্য নদীর আবর্তের মতো গম্ভীর, সূক্ষ্মতাহেতু কটিদেশ তরল গতিকে হরণ করে।

তার অতি রম্য উরু কদলীস্তম্ভেরও অধিক। সরস এবং সুমনোহর জঙ্ঘা বৃত্তাকার এবং নাতিদীর্ঘ।

চরণের অঙ্গুলী পদ্মরাজিসদৃশ, নখপংক্তিতে স্ফটিকখণ্ডের ভাঁতি এবং কোমল রোমা-বলীতে উদ্ভিন্ন কুসুমের মৃণালের ভাঁতি।

শৈলজা পার্বতীকে উৎপন্ন করার পর স্রষ্টা তার চেয়েও অধিক বিশেষত্ব যুক্ত করে এ-নায়িকার অঙ্গকে প্রকটিত করেছেন। কবিদের কেন অপরাধ হবে যখন স্বয়ং ব্রহ্মা পুনরুক্তিকে সৃষ্টি করেছেন।

এ-গাথাগুলো শ্রবণ করে রাজমরালগামিনী লজ্জাবতী পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধরিত্রী স্পর্শ করলো। এরপর উক্ত কণকাঙ্গী পথিককে ডাকলো এবং প্রশ্ন করলো, "হে পথিক! এখন তুমি কোথায় যাবে এবং কোথা থেকে আসছ?"

"হে সরোরুহদলনয়নে! হে কমলনেত্রে! হে শশধরবদনে! আমার নগরের নাম হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকজনপূর্ণ সাম্বপুর। উক্ত নগর ধবলতুঙ্গ প্রাকার এবং ত্রিপুর দ্বারা মণ্ডিত। সেখানে কোনও মূর্খকে দেখা যায় না, নগরের সকলেই পণ্ডিত।

"যদি চতুর কোনও ব্যক্তির সঙ্গে নগরে প্রবেশ করা যায় তবে মধুরতর মনোহর প্রাকৃতছন্দ শ্রুতিগোচর হবে। কোনও স্থানে চতুর্বেদজ্ঞাতা বেদের ব্যাখ্যা করছেন, কোথাও বিবিধরূপে নিবদ্ধ রাসক পঠিত হচ্ছে।

"কোথাও সুদৈবচেছুর প্রেম-কথা, কোথাও সুন্দর নলচরিত[২৩] এবং কোথাও বিবিধ বিনোদ-পূর্বক মহাভারতের কথা পঠিত হচ্ছে। কোথাও ত্যাগী ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ দিচ্ছেন এবং কোথাও মায়াবী নট রামায়ণের অভিনয় করছে।

"কিছু সংখ্যক লোক বংশী, বীণা, কাহল এবং মুরজ বাদন শুনছে, কোথাও পদবর্ণ (প্রাকৃত বর্ণ নিবদ্ধ) গীত-রব শ্রুত হচ্ছে, কোথাও সমর্থবান লোক পীনোন্নতস্তনী-নর্তকিগণের গীত শুনছে নৃত্য করবার সময় যাদের কটিবস্ত্র চঞ্চল হয়ে উঠছে।

"অপূর্ব (যে পূর্বে আসেনি) নর বিবিধ নট-নর্তকি দেখে বিস্মিত হয়। বেশ্যা পাড়ায় প্রবেশ করে মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়ে। বিশাল গজসদৃশ মন্থর গতিযুক্তা কোনও নর্তকী বা বেশ্যা মদবিহ্বল হয়ে ভ্রমণ করছে। কারো তাটঙ্ক বা কর্ণফুল হিল্লোলিত হচ্ছে।

"আবার কোথাও সুস্পষ্টরূপে উদ্ভূত ঘন তুঙ্গ বক্ষস্থলযুক্তা সুন্দরী ভ্রমণ করছে—বক্ষভারে কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ছেনা দেখে আশ্চর্য লাগছে। অন্য কোনও তরুণী কাজল-রেখাযুক্ত নয়নে কোপের ভাব প্রকাশ করে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে।

"আবার যখন কোনও সুবিচক্ষণা বিমল হাসি হাসছে তখন তার কপোলপ্রদেশকে মনে হচ্ছে যেন চন্দ্রের মধ্যে সূর্য প্রবিষ্ট হয়েছে (মুখমণ্ডল হচ্ছে চন্দ্র এবং হাসিতে উৎপন্ন শোভা হচ্ছে সূর্য।) কারো কুচস্থল মৃগনাভিপঙ্কাঙ্কিত, কারো বা তিলকালঙ্কৃত।

"কারো মজবুত এবং স্থূল মুক্তাহার অবস্থানক্ষেত্র না পেয়ে স্তনপটের শিখরদেশে লুণ্ঠিত হচ্ছে। কোনও রমণীর গম্ভীর নাভিবিবর কুণ্ডলাকার এবং ত্রিবলীতরঙ্গে মণ্ডলিত।

"কোনও রমণী গুরুবিকট রমণভার (নিতম্ব) অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে ধারণ করে আছে, যার কারণে তার গতিতে আশ্চর্যজনক লীলায়িত গতি এসেছে। সে তীব্রতার সঙ্গে চলতে পারছেনা। মধুর অক্ষর উচ্চারণের কারণে কোনও কামিনীর হীরকপংক্তি-সদৃশ দাঁত পান খাওয়ার কারণে আরক্ত দেখাচ্ছে।

"হাস্যে উদ্ভাসিত হবার কারণে কোনও মুগ্ধার অধরদল, করকমল এবং সরল বাহুযুগল শোভিত হচ্ছে। অন্য এক তরুণীর হাতের অঙ্গুলীর নখ উজ্জ্বল এবং বিমল, দ্বিতীয়া একজনের কপোল দাড়িম্ব-কুসুমদলসদৃশ।

"কারও সমৃদ্ধ ভ্রূযুগল[২৪] দেখে মনে হয় যেন অনঙ্গ কোপাবশতঃ ধনুক চড়িয়েছে। যখন একজনের নূপুরের ঘনরব শুনা যায়, তখন আবার অন্য একজনের রত্ননিবদ্ধ মেখলার রুনঝুন শুনা যায়।

"লীলাপূর্বক চলবার কারণে কোনও রমণীর চর্ম-পাদুকা মধুর শব্দ করে। যেন নব-শরদের আগমনে সারস শব্দ করে। অন্য কোনও রমণী যখন মধুর পঞ্চমধ্বনি করে তখন মনে হয় যেন তম্বুরাবাদক দেবতাদের সন্মুখে স্বর বাজাচ্ছে।

"এভাবে এক এক রূপ দেখতে দেখতে অগ্রসরমান পথিকের পা পানের রসে পিচ্ছিল হয়ে যায়। এরপরও যদি কেউ ভ্রমণ করতে চায় তবে বিবিধ উদ্যান দেখে সমস্ত সংসার ভুলে যাবে।

'অথ বনস্পতিনামানি'—এখন বনস্পতির নামোচ্চারণ—

দল্ল, কুন্দ, শতপত্রিকা, রক্তোৎপল, মালতী, মল্লিকা, জুঁই, খট্টণ, এলবালু (দারুচিনী), চম্পা, বকুল, কেতকী, নীলকমল, মাতুলিঙ্গ, মালুর, মাকন্দ, মুর, দ্রাক্ষা, মন্ত, আখরোট, আরূ, শতাবরি, তাল, তমাল, তুমড়া বা লৌকী, খদির বা খৈর, সঞ্জীবিনী, শতপত্রিকা, শিরীষ, শীশম, সকল।

পীপল, পাটল, পুজ, পলাশ, মনসার, তুজ, ধতূরা, ভূজে, ধায়, বাঁশের বন, নারিকেল, নিম্ব, নেউঞ্জী, বরগদ, ঢাক, আম, আমলা, ধুতুরা, চন্দন, আমড়া, আম্রাতক, গূলর, মধূক, ইমলী, অভয়া (হরিতকী), নাগবেলি, মঞ্জিষ্ঠা, মন্দার, সিধুঁবার, বালু, কঙ্কেল্লি, কুঞ্জ, কুঙ্কুম, কপিত্থ, দেবদারু, মল্লকী, বায়বিড়ঙ্গ, নীম, নীম্বু, চিনার, শমী, শাক, দেবদার, লসোঢ়া, এলাচী, লম্বী, লবঙ্গ, কনের, কৈর, কুরুবক, খতঙ্গ, অমিয়া, কদম্ব, বিভীতিকা, চোবা, রক্তাঞ্জন, জাম, অশোক, জম্ভীর, সহজন, নারঙ্গী, বীজৌরা নীম্বু, অগরু, রক্তশাল, অরিষ্টিকা, দমনক, গেন্দা, চীড়, খজুর, বের, বগরেন, বহেড়া, দমনক, তুলসীদল।[২৫]

"হে শশিবদনে! হে কমলদল নয়নে! এরপর আরও কোনও বৃক্ষ যদি থাকে তবে তার নাম কেইবা জানবে? সংক্ষেপে এটাই বুঝে নাও, এ-সব বৃক্ষের নিবিড় নিরন্তর ছায়ায় দশ যোজন পর্যন্ত চলা যায়।

"অঞ্চলের সবিস্তার বর্ণনা আমি করেছি যদিও তাতে অর্ধেকও বর্ণিত হয়নি।"

"হে পথিক! অদ্য গমন কোরনা, রবি নিশ্চিতরূপে অস্তমিত হচ্ছে।"(বিরহিণীর উক্তি)

"হে মৃগাক্ষি! তপন-তীর্থ চতুর্দিকে বিখ্যাত। সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা উক্ত তীর্থকে সুপ্রসিদ্ধ মূলস্থান (মূলতান) নামে জানে। উক্ত স্থান থেকে গোপনীয় লেখনের উপদেশ গ্রহণ করে অর্থাৎ গোপনীয় লেখনের সংকেত বুঝে এবং তা সঙ্গে নিয়ে, আমার প্রভু কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে খম্ভাত বা স্তম্ভতীর্থে যাচ্ছি।"

উক্ত চন্দ্রমুখী কমলাক্ষী মুগ্ধা পথিকের বচন শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুহাতের অঙ্গুলী ভাঙ্গতে লাগলো এবং করুণ গদগদ কণ্ঠে শব্দ করে বায়ু-প্রতাড়িত কদলীবৃক্ষের মতো অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো।

ক্ষণার্দ্ধ ক্রন্দন করে এবং নয়ন মুছে সে আবার বললো, "হে পথিক! খন্তাতের নাম শুনে আমার শরীর জর্জরিত হচ্ছে। সেখানে বিরহ-প্রজ্জ্বালনকারী আমার পতি বাস করে। অনেক দিন গত হচ্ছে কিন্তু সে-নির্দয় এখনও আসেনি।

"হে পথিক! যদি নিমেষকাল দয়া করে একটু বস, তা হলে আমি অল্প কিছু অক্ষরে প্রিয়তমের কাছে কিছু সন্দেশ প্রেরণ করি।"

পথিক বললো, "হে কনকাঙ্গি! যা বলবার বলো, ক্রন্দনে কি লাভ? উদ্বিগ্ন মৃগনয়না! তুমি দিন রাত ক্ষীণ কেন হয়ে যাচ্ছ?"

"প্রিয়তমের অন্তর্ধানের পর বিরহের আগুনে যে মন আমাকে ভস্মীভূত করলোনা সে-নিষ্ঠুর মন কি করে সন্দেশ প্রেরণ করে?" (বিরহিণীর উক্তি)।

"পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কর্দমের হৃদয় ফেটে যায়, যদি মানুষেরও সে-রকম হয় তবে তার প্রেমকে যথার্থ জানবে।

"হে পথিক! আমি নিশ্চিত জানি যেখানে প্রেম নেই সেখানে প্রিয়কে কান্ত বলা চলেনা। যে আজও কান্ত ছাড়া বেঁচে আছে তার প্রেরিত সন্দেশের কি সার্থকতা?

"যার প্রবাস কালে আমি প্রবাস করিনি, যার বিয়োগে আমার মৃত্যু হয়নি, পথিক! তাই প্রিয়কে সন্দেশ-প্রেরণের কালে আমার লজ্জা হচ্ছে।

"পথিক! তবে যদি লজ্জা করে সন্দেশ প্রেরণ না করি তবে হৃদয়কে ধারণ করে রাখতে পারবোনা। হাত ধরে স্তুতি করে প্রিয়কে একটি গাথা বলবে।

"হে নাথ! তোমার বিরহের প্রহারে বিচূর্ণিত অঙ্গ যদি ছিন্নভিন্ন না হয়ে থাকে তবে তার কারণ এই, আজ অথবা কাল মিলনের আশা আছে, এই ধারণারূপ ঔষধ তাকে ছিন্নভিন্ন হতে দিচ্ছেনা।

"অঙ্গ-দহনের ভয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিনা। যেমন আমি প্রিয়-দ্বারা বিচ্ছেদিত হয়েছি, তেমনি আমার শ্বাসেরও যমরাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

"পথিক! এ গাথা বলবার পর প্রিয়কে স্তুতি করে আরও পাঁচটি দোহা বলবে।

"প্রিয়! হৃদয়স্থিত তোমাকে ছেড়ে যদি তোমার বিরহাগ্নিতে সন্তপ্ত হয়ে সুরলোকে চলে যাই তবে তা পরিপাটী হবেনা।

"কান্ত! হৃদয়ে তোমার স্থিতি থাকা সত্ত্বেও বিরহ কায়াকে কষ্ট দিচ্ছে। অন্যের নিকট সৎপুরুষের পরাভবের সন্তাপ মরণেরও অধিক।

"তোমার পৌরুষ-নিলয় থাকতে এটা কি গুরুতর পরিহাস নয় যে, যে-অঙ্গে তুমি বিলাস করেছ বিরহ তাকে দগ্ধীভূত করছে?

"বিরহের প্রহার আমার শরীরে নিরপেক্ষ হচ্ছে, তাতে দেহ বিচূর্ণিত হচ্ছে সত্য কিন্তু হৃদয়কে তোমার দ্বারা সম্মানিত দেখে, বিরহ হৃদয়কে আহত করতে পারছেনা।

"বিরহের সম্মুখে আমার কোনও সামর্থ্য নেই, তাই আমি ক্রন্দন করছি। বধূকে পতি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে কিন্তু তার পালনকারী ধাত্রী কেবল রোদন করতে পারে। অর্থাৎ তোমার প্রেমজনিত বিরহ আমার মনকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতে পারে, দেহধারিণী আমি কেবল ক্রন্দন করতে পারি।

"সন্দেশ অর্থাৎ বার্তাতো সবিস্তৃত, অন্যপক্ষে আমি বক্তব্য প্রকাশে অসমর্থ। প্রিয়কে বলবে, একটি বলয়ের মধ্যে আমার দুটি হাতই প্রবেশ করতে পারে অর্থাৎ বিরহ-জনিত দুর্বলতার কারণে আমার দুটি হাত এত শীর্ণ যে একটি বালার মধ্যে দুটি হাতই প্রবেশ করতে পারে।

"সন্দেশ তো সবিস্তৃত কিন্তু আমি বল্‌তে অক্ষম। যে আংটি ছিলো কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর, তার মধ্যে আমার বাহু এখন প্রবেশ করতে পারে।"

তখন শীঘ্র গমনের ইচ্ছা থাকায় পথিক দোহাগুলো শুনে বললো, "হে সুবিচক্ষণা! আরও যদি কিছু বলবার থাকে বলো, হে মুগ্ধা! আমাকে গন্তব্যপথে যেতে হবে যা অত্যন্ত দুর্গম!"

এ-বচন শুনে সে কামদেবের বানে বিদ্ধ হল, যেমন করে শিকারী কর্তৃক বিক্ষিপ্ত বানে হরিণী ত্রস্ত হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং আপন নেত্রে বর্ষা প্রবাহিত করে বিরহিণী এই গাথা পাঠ করলো—

"আমার ধৃষ্ট নেত্র যার বর্ষণ কখনও নিবৃত্ত হয়না, এবম্প্রকার অশ্রুবর্ষণে কখনও লজ্জিত নয়। যদিও বিরহাগ্নি এ-বর্ষণে নেভে না বরঞ্চ খাণ্ডববনের অগ্নিদাহনের মতো আরও তীব্রভাবে জ্বলে।"

এ-গাথা পড়ে অতি করুণ দশাযুক্তা, দুঃখিনী, মৃগাক্ষী বিরহিণী কঠিন নিশ্বাস ফেলে পথিককে বললো, "রতি-আশা-সুখে বিঘ্ন উৎপাদনকারী সে নির্দয়ের নিকট দুটি চৌপাই বলবে।"

"হে কাপালিক! তোমার বিরহ বিরহিণীকে কাপালিক বানিয়েছে। তোমাকে স্মরণ করে আমি মোহের বিষম সমাধিতে স্থির রয়েছি, যেমন কাপালিকের হাতে সর্বদা করোটী থাকে, তেমনি বাম করপটে স্থিত আমার মস্তক এক মুহূর্তের জন্যও সরেনা। কাপালিক এক মুহূর্তের জন্যও যেমন সিদ্ধাসন এবং খট্টাঙ্গ ছেড়ে উঠেনা, একই ভাবে আমিও আমার শয্যাসন এবং খাটের পায়া ছেড়ে উঠিনা অর্থাৎ সর্বদা খাটের এক কিনারায় পড়ে থাকি।

"আমার তেজ হ্রাস পেয়েছে, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, কেশ আলুলায়িত হয়েছে, মুখ-মণ্ডল মলিন হয়েছে, গতি স্খলিত হয়েছে, কুঙ্কুম এবং স্বর্ণাভ দেহের কান্তি কালো হয়েছে। হে নিশাচর! তোমার বিরহে মুগ্ধা আমি নিশাচরী হয়েছি।

"তুমি তোমার কর্ম সম্পাদনার জন্য আকুল আর এদিকে আমি পত্রও লিখতে পারছিনা। পথিক! স্নেহবশতঃ প্রিয়তমের কাছে দটি গাথা বলবে।

"হে প্রিয়। বিরহানলের উৎপত্তি হয়েছে বাড়বাগ্নি থেকে। ঘন অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েও সে অধিক প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে।

"হে পথিক তুমি প্রিয়কে বলবে, প্রস্থতাক্ষী দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাসে শুকিয়ে মরে যেত যদি নয়নের নিরন্তর অশ্রুধারা তাকে নিশ্চিত রূপে সিঞ্চিত না করতো।

পথিক বললো, "হে চন্দ্রমুখী আমাকে যেতে দাও, অথবা হে মৃগনয়না, যা কিছু বলবার আমাকে বল।" তখন বিরহিণী বললো, "হে পথিক, বলবো কি বলবোনা? তুমিই বল, স্নেহ এবং প্রেমরহিত যে ব্যক্তি আমার এ অবস্থা করেছে তাকে বলে কি লাভ?

"যার দ্বারা আমি বিরহের কুহরে পতিত হয়েছি, যে অকৃতার্থ অর্থলোভে আমাকে একা ফেলে গিয়েছে, তাকে বলে কি লাভ? আমার সন্দেশ তো সবিস্তর এবং তুমি চলে যাবার জন্য উৎসুক। হে পথিক, প্রিয়ের কাছে গাথা, বত্থু তথা ডোমিল্ল পাঠ করবে।[২৬]

"যখন এক সময় সংযোগের অবস্থায় নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে একটি হারেরও প্রবেশ সম্ভব ছিলোনা, সেখানে এখন আমাদের দুজনের মধ্য সাগর, সরোবর, পর্বত, বৃক্ষ এবং দুর্গের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

"আপন পতির সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠায় বিরহ আকুলিতা প্রিয়ের শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় এবং ধন্যা রমণীরা স্বপ্নে প্রিয়ের শরীরের স্পর্শ এবং আলিঙ্গন, অবলোকন, চুম্বন এবং সুরত-স্বাদ পায়। সে নির্দয়কে হে পথিক! এ কথা বলবে, যে-দিন তুমি গিয়েছ সেদিন থেকে আমার নিদ্রা নেই। অতএব স্বপ্নে সঙ্গ-সুখ কি পাব? অর্থাৎ নিদ্রা নেই বলে আমার স্বপ্নও নেই তাই স্বপ্নে তোমার সঙ্গসুখ পাচ্ছিনা।

"হে নির্দয়! প্রিয়-বিরহজন্য বিয়োগে দিবারাত্র সঙ্গমের চিন্তায় চিন্তিতমনা আমি কিইবা বলতে পারি। পরন্তু অমার রূপ নামক বস্তুকে যে প্রিয় আপন সুন্দর শরীর দিয়ে স্পর্শ করেছে, প্রীতিপূর্বক দৃষ্টি দিয়ে যাচ্ঞা করেছে সে-রূপ নামক বস্তু বিরহ নামক চোর অপহরণ করেছে যখন আমি মোহাচ্ছন্ন অবস্থান সময় অতিবাহিত করছিলাম। হায়! লুণ্ঠিতা আমি এখন কার শরণে যাব।

এই ডোমিল্ল ছন্দের সন্দেশ উচচারণ করে উক্ত চন্দ্রবদনী কমলদল-নয়না ক্ষণকালের জন্য নিস্পন্দ হোল। সে কিছু বলছিলোনা, কিছু দেখছিলোনা, সে যেন তখন ভিত্তিতে উৎকীর্ণ চিত্রের উপমা।

উচছ্বাস এবং ভ্রমে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। রোদনার্তমুখী, কামদেবের বাণবিদ্ধা প্রিয়-সংযোগের সুখ-স্মারণকারিণী উক্ত বিরহিণী অপাঙ্গে চঞ্চল চক্ষু দিয়ে পথিককে দেখলো—তার দৃষ্টি ছিলো ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীরের শব্দে ত্রস্ত হরিণীর মতো।

পথিক বিরহিণীকে বললো, "স্থির হও, ধৈর্য ধর, ক্ষণকালের জন্য আশ্বস্ত হও, বস্ত্রের সাহায্যে পূর্ণচাঁদের মতো মুখ মুছে ফেল।" তার কথা শুনে বিরহের ভারে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত লজ্জাবতী আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো।

"হে পথিক! কামদেবের সম্মুখে আমার বল প্রদর্শন করা শোভা পায়না। বিনা দোষে অনুরক্ত প্রিয় বিরক্ত হয়েছে। সেই স্নেহহীন চলে যাবার সময় আমার বেদনার কথা শুনলোনা। সেই খলকে একটি মালিনীবৃত্ত[২৭] বলবে।

"যদি বিরহ এবং বিরতির অবস্থায় সুখ নষ্ট হবে বলে জানতাম, তাহলে সুখের উদ্বেলতার সময় তার অনুরাগ এবং স্নেহকে কুসুম্ভী রং-এর একটি ঘড়ায় ভরে রেখে দিতাম এবং এখন আমার রাগহীন হৃদয়কে তার মধ্যে ডুবিয়ে নিতাম।

"যদি বস্ত্র রংবিহীন হয় তবে তা পুনরায় রাঙানো যায়, যদি অঙ্গ স্নেহহীন বা রুক্ষ হয় তবে তাতে তেল মালিশ করে তার চাকচিক্য ফিরিয়ে আনা যায়, জুয়াখেলায় কোনও দ্রব্য হারালে জিতে আবার তা পাওয়া যায় কিন্তু প্রিয়ের বিরক্ত হৃদয়কে কি করে বদলানো যায়?"

পথিক বললো, "হে প্রস্থতাক্ষি বা বিশালনয়না! ধৈর্যধারণ কর, মনকে ঠিক পথে আন, নয়ন থেকে নিরন্তর বহমান অশ্রু সংবরণ কর। প্রবাসী বিবিধ কাজে বিদেশে যায় এবং সেখানে পরিভ্রমণ করে। আপন কাজ সিদ্ধ না হলে সে কি করে ফিরবে?

"হে মুগ্ধা! কামদেবের বাণের প্রহার সহ্য করে, আপন গৃহিণীকে স্মরণ করে বিরহের বশীভূত হয়ে সে বিদেশে পরিভ্রমণ করছে। দিবারাত্র প্রিয়-বিরহ সহ্য করতে না পেরে তুমি যেমন ব্যাকুল হয়েছ, একইভাবে সেও বিরহ-ব্যাকুলতায় ক্ষীণতনু হয়েছে।"

এ-কথা শুনে বিশাল-নয়না মদনোৎসুকা উক্ত রমণী অড়িল্ল[২৮] ছন্দ পাঠ করলো।

"যদ্যপি আমি মনে করছি, আমার প্রতি কান্তের স্নেহ নেই, তবুও হে পথিক! প্রিয়ের কাছে আমার এ-সন্দেশ বলবে যে, বিরহাগ্নির মধ্যে আমি নাসিকা পর্যন্ত ডুবে রয়েছি। আমার হৃদয় রাতের অন্ত পর্যন্ত জ্বলছে।

"আমি মদনবাণে ব্যথিত। বিস্তারিত করে সন্দেশ বলতে পারছিনা। আমার এ-অবস্থার কথা কান্তকে বলবে। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, নিতান্ত অস্থিরতা ব্যাপ্ত হয়েছে, জাগ্রত অবস্থায় নিশা যাপিত হচ্ছে, শরীরের শিথিলতায় পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে।

"মাথার জুড়া বেঁধে তা ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিনা, চোখের কাজল কপোলে গড়িয়ে পড়ছে। প্রিয়ের আগমন আশায় শরীর সুস্থ হতে না হতেই বিরহাগ্নিতে তা আবার শুকিয়ে যাচ্ছে।

"আশার পানিতে সংসিক্ত হয়ে আবার বিরহের উষ্ণতায় জ্বলে আমি বেঁচে আছি না মরে গিয়েছি? হে পথিক! কম্পমান হৃদয়ে কোনও ভাবে বেঁচে আছি।"—ইতিমধ্যে মনে পুনঃ পুনঃ ধৈর্য ধারণ করে এবং চোখ মুছে দীর্ঘাক্ষী এক ফুল্লক[২৯] বললো।

"স্বর্ণকারের মতো আমার হৃদয় প্রথমে প্রিয়ের জন্য উৎকণ্ঠা উৎপন্ন করে, পরে বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ করে আশার পানিতে সিঞ্চিত করে।"

পথিক বললো, "অনবরত রোদন করে পথগামী আমার জন্য অমঙ্গল এনোনা, ধৈর্য ধারণ করে অশ্রু সম্বরণ কর।"

"পথিক! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার অদ্যকার যাত্রা সিদ্ধ হোক। আমিতো ক্রন্দন করছি না—বিরহাগ্নিধূমে আমার লোচন স্রবিত হচ্ছে।"

পথিক বললো, "হে প্রস্থতাক্ষী! যা কিছু বলবার দ্রুত বল। সূর্য দিনান্ত পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। দয়া করে আমাকে যেতে দাও।"

"হে পথিক! তোমার নিত্য নবীন মঙ্গল হোক। আমার প্রিয়ের নিকট একটি মড়িল্ল এবং একটি চূড়িল্ল ছন্দ বলবে।"[৩০]

"তনু দীর্ঘশ্বাসে শুষ্ক হচ্ছে কিন্তু অশ্রু শুকাচ্ছেনা। হৃদয় উড়ে যেয়ে পড়েছে দ্বীপান্তরে যেমন পতঙ্গ পড়ে দীপে।"

"উত্তরায়ণে দিন বাড়তে থাকে এবং দক্ষিণায়ণে রাত বাড়তে থাকে—এ নিয়ম পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। কিন্তু যেখানে দুটোই বাড়ে সে-তৃতীয়টি হচ্ছে বিরহায়ণ।

"পথিক! দিবস শেষ স্থিতিতে এসে পৌঁছেছে। এখন যাত্রা স্থগিত কর। এখানেই রাত কাটিয়ে দিবাকালে আবার যাত্রা করবে।"

"হে বিম্বাধরা! সূর্যকে প্রভাতে জ্বলন্ত মনে হয়, তাই আমি রাত্রিতেই যাব। তা ছাড়া আমি আমার কার্য সম্পাদনার জন্য অত্যন্ত আকুল।"

"যদি এ স্থানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়, এবং যদি যেতেই হয়, তা হলে হে পথিক প্রিয়কে চূড়িল্লক, খড়হড়ক[৩১] এবং গাথা বলবে।"

"প্রিয়ের নিকট গিয়ে বলবে তোমার প্রবাসকালে আমি বিরহাগ্নির ফল প্রাপ্ত হয়েছি। তা হচ্ছে, আমি চিরঞ্জীব হবার বর পেয়েছি যার ফলে একটি দিনকে সংবৎসরতুল্য মনে হচ্ছে।"

"যদি প্রিয়-বিয়োগে আমার হৃদয় বিহ্বল হয়, কামদেবের বাণে অঙ্গ পূর্ণরূপে আহত হয়, নয়নের অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডদেশ প্লাবিত হয় এবং যদি মনের মধ্যে কামদেব নিত্য উদ্দীপ্ত হতে থাকে, তা হলে হে পথিক! রাত্রিতে আরাম কি করে পাব এবং নিদ্রাই বা কি করে আসবে? প্রিয়-বিরহিনী যে কিছুদিন বেঁচে থাকছে এটাইতো আশ্চর্য।"

পথিক বললো, "হে কণকাঙ্গি! তুমি যত কিছু বলেছ এবং আমি যত কিছু দেখলাম তারও অধিক আমি কিছু বলবো। এখন তুমি আপন গৃহে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা কর এবং আমি আপন পথযাত্রায় প্রবৃত্ত হই। আমার যাত্রায় বাধা সৃষ্টি কোরোনা। পূর্ব দিশায় অন্ধকার বিস্তৃত হয়েছে, সূর্য অস্তাচলে গিয়েছে। রাত্রিকালে যাত্রা কষ্টসাধ্য এবং আমার পথও দুর্গম ও ভয়ানক।"

পথিকের বচন শুনে প্রিয়-বিরহিণী তন্বঙ্গী দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার কপোলে ইতঃস্ততঃ যে-সব অশ্রুবিন্দু ছিলো সেগুলোকে মনে হচ্ছিলো বিদ্রুমপুঞ্জের উপর শ্বেত মৌক্তিক। প্রবাসী প্রিয়ের জন্য দুঃখিত হয়ে সে ক্রন্দন ও বিলাপ করে পথিককে বললো, "হে পথিক! আমার প্রিয়তমের নিকট একটি স্কন্ধক[৩২] এবং দ্বিপদী বলবে।"

"আমার হৃদয়রূপী রত্ননিধি তোমার কঠিন বিরহরূপী মন্দার পর্বত দ্বারা নিত্য মথিত হচ্ছে। মথিত হয়ে সমগ্র সুখরূপী রত্ন উন্মূলিত হয়েছে।

"মদনসমীরণের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বিরহানল-দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ আমার হৃদয়ে তীব্রতার সঙ্গে স্ফুরিত হচ্ছে জ্বালা সৃষ্টি করছে। বিরহাগ্নিকে ধারণ করা কঠিন হয়েছে, ব্যাকুলতার ক্ষার অর্থাৎ অঙ্গার ক্ষিপ্ত অথবা দীপ্ত হবার ফলে বিরহাগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। এ-এক আশ্চর্য ব্যাপার যে তোমার জন্য উৎকণ্ঠার কারণে আমার সরোরুহ অর্থাৎ শ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

স্কন্দক এবং দ্বিপদী শুনে পথিকের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল এবং নায়িকার প্রেম স্বয়ং অনুভব করে প্রেমানুভূতিতে পরিবেষ্টিত তার চিত্ত অনুরক্ত হল। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পথিক বললো, "হে মৃগনয়না, ক্ষণকাল ধৈর্যধারণ করে শ্রবণ কর। হে শশিবদনা, কিছু প্রশ্ন করবো, তার স্পষ্ট উত্তর দাও।"

"নবমেঘ থেকে নিষ্ক্রান্ত, নির্মল কিরণ স্ফুরণকারী শরদ রজনীর প্রত্যক্ষ অমৃতস্রাবী যে চন্দ্রমা তার চেয়েও অধিক সুন্দর প্রিয়ের চিত্তে সুখ উৎপন্নকারী তোমার মুখকান্তি বিরহাগ্নির ধূমে কবে থেকে আচ্ছাদিত ?

"কোন দিন থেকে তোমার বক্রকটাক্ষযুক্ত মদোন্মত্ত নেত্র থেকে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে ? হংস-সদৃশ লীলায়িত গতিকে সরল গতিতে পরিণত করে কখন থেকে কদলীসদৃশ কোমল অঙ্গ শুকিয়ে যাচ্ছে ?

"তরলাক্ষি! তুমি আপনাকে এ-প্রকার দুঃখের কবলে কখন থেকে অর্পণ করেছ ? দুঃসহ বিরহ করপত্রে তোমার অঙ্গ কখন থেকে কর্তিত হচ্ছে ? কামদেবের তীক্ষ্ণশর কখন থেকে তোমার হৃদয়কে আহত করছে ? হে সুন্দরী ! বল, কতদিন হল তোমার সুভগ প্রবাস গিয়েছেন ?"

পথিকের বচন শুনে বিশালনয়না গাথা চতুষ্টক পাঠ করলো।

"হে পথিক ! আমার প্রিয়তমের প্রবাস-গমনের দিনের কথা জিজ্ঞেস করে কি লাভ যেদিন থেকে আমি সুখকে হারিয়ে দুঃখের প্রতিপট্ট পেয়েছি ?

"বল, বিয়োগের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলো যে দিবস সে দিনকে স্মরণ করে কি লাভ যে দিবসে ক্ষণার্ধের মধ্যে প্রিয় চলে গিয়েছিলেন। সে দিনের নাম উচ্চারণ কোরোনা।

"যে দিবসে সুভগ গিয়েছেন সে-দিন থেকেই আমার অনিবৃত্তি বা অস্থিরতা। হে পথিক! সে দিন আমার কাছে অনন্তকালের সমতুল্য মনে হচ্ছে।

"যে গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রিয়তম আমাকে ছেড়ে গিয়েছেন, সে-গ্রীষ্ম জ্বলছে গ্রীষ্মাগ্নিতে। যে গ্রীষ্ম দ্বারা আমি শোষিত হচ্ছি সে বিশুষ্ক হচ্ছে মলয়গিরির সমীরণে।"

তৃতীয় প্রক্রম

অথ গ্রীষ্ম বর্ণনম

"হে পথিক ! নব গ্রীষ্মাগমে নাথ যখন প্রবাসী হলেন, তখন আমার সমুদয় সুখও করাঞ্জলি করে বিদায় নিল। অর্থাৎ তখন থেকেই সর্বদা সুখের অভাব হল। তারপর বিরহের অগ্নিতে তপ্ত শরীরিণী আমি বিহ্বল মনে গৃহে প্রত্যাগমন করলাম।

"আমি রতিহীনতার দুঃখ এবং সুখের অভাব সহ্য করতে পারছিনা। আমার মতো মদনাক্রান্তার জন্য মলয়-সমীরণও দুঃসহ হয়েছে। সূর্যের কিরণ তীব্র জ্বালায় পৃথিবীর বনতৃণকে দগ্ধীভূত করে আমাকে তপ্ত করছে।

"আকাশ যমের চঞ্চল জিহ্বার মতো লক্‌লক্ করছে, ধরাপৃষ্ঠ সূর্যতেজ সহ্য করতে না পেরে শব্দ করে ফেটে যাচ্ছে। ব্যোমতলে যে অতি উষ্ণ প্রভঞ্জন প্রবাহিত ছিলো, তার বাত্যাচক্র বিরহিণীর অঙ্গ স্পর্শ করে তাপিত করছে।

"নবমেঘ দেখে উৎকণ্ঠিত চাতক পিউ পিউ শব্দ করছে। নদীর জলধারা স্বচ্ছ এবং লঘুভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, ফলভারে আনত হবার ফলে বৃক্ষকে অধিক সুন্দর দেখাচ্ছে—কুঞ্জর শ্রবণের মতো কম্পমান এবং গন্ধবহ।

"পাতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আম্রমুকুলের উৎকণ্ঠায় শুকদম্পতি বসে রয়েছে। কম্পমান পল্লবের সাথে তারা আন্দোলিত হয় এবং তাতে করুণধ্বনি উৎসারিত হয়। পথিক! সহকার বন আমাকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব করেছে।

"শীতলতার জন্য যে হরিচন্দনের প্রলেপ লাগিয়েছিলাম সর্প দ্বারা সেবিত হবার কারণে তা আমার স্তনকে তাপিত করছে। অতঃপর বিবিধ বিলাপ করে আমি যখন হারলতা এবং কুসুমমাল্য সেখানে ধারণ করি সেগুলোও জ্বালা উৎপন্ন করে এবং আমি ভীত হই।

"রাত্রিতে যদি শয্যার উপর শরীরের সুখের জন্য কমল-দল বিছানো হয় তবে তাও দ্বিগুণ উদ্বেগ উৎপন্ন করে। এভাবে শয্যার উপর একবার উঠি একবার পড়ি এবং লজ্জিত হয়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে 'বস্তক' এবং 'দোধক' পাঠ করি।[৩৩]

"রবিকিরণের দ্বারা বিকশিত হবার কারণে অরবিন্দ বা কমল তাপিত হয়। গরলের সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে বলে অমৃতময় চন্দ্রমাও দাহ উৎপন্ন করে। দুঃসহ ভুজঙ্গের দ্বারা দংশিত হবার কারণে (অর্থাৎ বিরহরূপ ভুজঙ্গে) চন্দনেও দেহ তাপিত হয়। কুসুমের বাণের দ্বারা (অর্থাৎ কামদেবের দ্বারা) বিক্ষত বলে পুষ্পমাল্যও দেহকে পীড়িত করে। অর্থাৎ কমল, চন্দ্র, চন্দন ইত্যাদি শীতল বটে কিন্তু এগুলোর কোনোটাতেই বিরহাগ্নি জ্বালা শান্ত হয় না বরঞ্চ অঙ্গকে আরও অধিক পীড়িত করে।

"ঘনসার, কর্পুর এবং চন্দনের প্রলেপে দেহ শীতল হয় একথা সত্য নয়। প্রিয় বিরহের জ্বালা একমাত্র প্রিয়তমই শান্ত করতে পারে।"

বর্ষা বর্ণন

"এভাবে কষ্টপূর্বক আমি তাপদাহন গ্রীষ্ম অতিক্রম করলাম। পথিক, এর পর এলো বর্ষা ঋতু, কিন্তু তখনও আমার দৃষ্ট প্রিয় এলোনা। চতুর্দিক গুরুভার প্রাপ্ত সঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত হল, গগনে মেঘ ক্রোধপূর্বক গর্জন করতে লাগলো।

"গগনের ভয়প্রদ, ভীষণ বিদ্যুৎপ্রভা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো ভূমি-মার্গকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। জল পেয়ে তৃপ্ত চাতক সরস শব্দ করছে, নবমেঘের নীচে উড়ন্ত বকপংক্তি শোভা পাচ্ছে।

"গ্রীষ্মঋতুর তীক্ষ্ণ তাপে উত্তপ্ত সূর্যের কিরণে জল শোষিত হয়ে পুনরায় এত ভয়ঙ্কর বৃষ্টিরূপে পতিত হয় যে নদী তা ধারণ করতে পারেনা। উপছে-উঠা নদীর জল পথ-ঘাট প্লাবিত করে এবং পথচারী পথিক বাধ্য হয়ে পাদুকা হস্তে ধারণ করে এবং আকাশের বিদ্যুৎ তাকে পথ দেখায়।

"নিবিড় লহরীতে ঘনান্তর সংযোজনের কারণে দুস্তর হয়ে নদী কলকল শব্দে গর্জন করছে। প্রবাসী দিশাহারা হয়ে থেমে পড়ছে। আপন কার্যবশতঃ লোকে নৌকোতে যাচ্ছে, তুরঙ্গ আরূঢ় হয়ে পথ চলছেনা।

'যেভাবে রমণী প্রিয়তম-সঙ্গমের সময় শরীরে চন্দনের প্রলেপ লাগায়, লজ্জাবশতঃ শরীরকে আবরিত করে, নয়ন মুদিত করে, অন্ধকারের অভিলাষ করে এবং কুসুম্ভী রং-এর বস্ত্র ধারণ করে, সেভাবে পৃথিবী মেঘরূপী পতির আগমনের সময় বিচিত্ররূপে সজ্জিত হয়।' এ-অনুবাদটি ভাবানুবাদ। শব্দগত অনুবাদ হচ্ছে-'পৃথ্বী কর্দমে আচ্ছা-দিত হয়ে ধবলাঙ্গিনী হয়েছে (যেন চন্দনলিপ্ত ধবলাঙ্গিনী নায়িকা)। বিবিধ ভাঁতিতে সজ্জিত হয়েছে। বিদ্যুতের চকিত প্রকাশে জলভরা মেঘের ছায়ায় তাকে লজ্জাবতী বধূর মতো মনে হচ্ছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছেনা। চতুর্দিকে অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে। ইন্দ্র গোপীদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে শিহরিত হচ্ছে (যেভাবে নায়িকা কুসুম্ভী রং-এর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে সমাগম-উৎকণ্ঠায় শিহরিত হয়)।

"বক জলাশয় ছেড়ে বৃক্ষের শিখরদেশে বিরাজমান হচ্ছে, উচ্চ পর্বতশিখরে ময়ূর তাণ্ডব নৃত্য করে শব্দ করছে। জলাশয়ে ভেক কর্কশ শব্দ করছে। আম্রশিখরে উঠে কোকিল কল কল শব্দ করছে।

সাপের সমাগমে দশদিশা পথ রুদ্ধ হয়েছে। অত্যধিক জলের কারণে পথমার্গে তাদের সঞ্চরণ বন্ধ হয়েছে। নীরতরঙ্গভারে পাটল দল পরিখণ্ডিত হয়েছে। পর্বতের উপর অবস্থান করে হংস করুণ স্বরে রোদন করছে।

"মাছি এবং কীটের ভয়ে গাভী উঁচু স্থানে স্থির হয়ে রয়েছে। গোপাঙ্গনারা তাদের পতির সঙ্গে মনোহর ক্রীড়া করছে। হরিতাকুলে আচ্ছাদিত পৃথিবী কর্দমে সুগন্ধিত হয়েছে। অনঙ্গদেব আমার অঙ্গ-অঙ্গকে আরও অধিক ভঙ্গ করে দিয়েছে।

"অতি দুঃখিনী আমি বিষম শয্যায় লুণ্ঠিত হই। ভ্রমরের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ মদন শরে বিদ্ধ হয়ে নিদ্রালাভ না করার কারণে নিষ্পলক নেত্রে রাত্রি জেগে উদ্বিগ্না আমি বস্তু, গাথা এবং দোহা রচনা করেছি।

"দশদিক থেকে বাদলের সমাগমে আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে। ঘোর গর্জন করে সঘন কৃষ্ণমেঘ উন্নমিত হয়ে এসেছে। আকাশপথে চঞ্চল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দাদুরের রৌদ্র শব্দ সহ্য করা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে মেঘ যেন রণক্ষেত্রে রৌদ্র শব্দে সৈন্য প্রচালন করছে। পথিক! সে মুহূর্তে শিখরস্থিত কোকিলের দুঃসহ কূক শব্দ কি করে সহ্য করব?

"গ্রীষ্মের অগ্নিদাহন বর্ষার ধারায় শান্ত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা আমার হৃদয়ের বিরহাগ্নি আরও অধিক প্রজ্জ্বলন্ত হচ্ছে।

"এ-দোহা পাঠ করে বিরহের কষ্টের কারণে আলস্য এবং মোহের পরবশ অতিক্ষীণা আমি চিরপ্রবাসিত প্রিয়কে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নের সত্য জেনে সে-সময় আমি তাঁর হাত ধরে একথা বললাম—

"হে প্রিয়, উচচ কুলে উৎপন্ন ব্যক্তির কি উচিত যে যখন প্রচণ্ড শব্দ করছে তীব্র ঘনঘটা সে-সময় সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশে থাকবে ?

"হে প্রিয়! নব মেঘমালা থেকে সম্পন্ন, ইন্দ্রধনু থেকে রক্তিম চতুর্দিকে ঘন বাদলে আচ্ছাদিত—চন্দ্রমার কারণে এ-বর্ষাকাল দুঃসহ।

"রাগরুদ্ধ কণ্ঠাগ্রা আমি (অর্থাৎ অনুরাগে আমার কণ্ঠনালি রুদ্ধ) স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বললাম আমি কোথায় আর প্রিয়তমই বা কোথায়! আমার অঙ্গ যেন প্রস্তর সদৃশ কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটেনি। পাপবন্ধন থেকে যখন প্রাণ নির্গত হতে পারলোনা তখন হৃদয় কেন ফেটে গেলোনা ? মনে হয় এটাও যেন বজ্রের তৈরী।

"কামোদ্দীপক স্বরে পুষ্করিণীতে ভেক যখন করুণ স্বরে শব্দ করছিলো, আমি তখন রাত্রির অন্তিম প্রহরে এ-দোহা পাঠ করলাম—

"হে যামিনী তোমার বচনীয়তা তিন ভুবনে আবদ্ধ থাকেনা। তুমি দুঃখে চতুর্গুণ তীব্র হও এবং সুখ-সঙ্গমে ক্ষীণ হতে থাক।"

শরদ বর্ণন

"এ-প্রকার বিলাপ করে, গীত গেয়ে এবং প্রাকৃত পাঠ করে আমি কিছুকাল কাটালাম। প্রিয়ের অনুরাগবশতঃ যে রমণীয় রাত্রিতে আমি গীত গেয়েছি সে-রাত্রিই আমার কাছে করপত্রের সমান কষ্টদায়ক বিবেচিত হত।

"হে পথিক! এ-ভাবে জাগরণে এবং প্রিয়ের আগমন আশায় তাপিত হয়ে আমি রাত কাটাতে লাগলাম। প্রাতঃকালে শয্যাসন ছেড়ে মনে বিরহনাশক প্রিয়ের কথা স্মরণ করতে করতে এবং ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ আকাশে দৃষ্টিপাত করে সহসা অগস্ত্য তারাকে দেখে মনে ভাবলাম বর্ষা শেষ হয়েছে। এখনও প্রিয় পরদেশে রয়েছেন।

"আকাশে বাদল বিদীর্ণ হয়ে চলে গেল। রাত্রিতে আকাশে মনোহর তারা দেখা যেতে লাগলো। ফণীন্দ্রের অবস্থান ঘটলো পৃথিবীর নীচে। রাত্রিতে নির্মল চন্দ্রের জ্যোৎস্না স্ফুরিত হতে লাগলো।

"সরোবরের জল শতপত্রিকায় শোভিত হল এবং নদীর প্রবাহ শোভিত হল বিবিধ তরঙ্গে। নব সরোবরের যে শোভা গ্রীষ্ম দ্বারা অপহরিত হয়েছিলো, নব শরদ আগমনে তা আবার ফিরে এলো।

"হংস কমলের রস সন্ধান করে রভসপূর্বক মনোহর কল-কল শব্দ করলো, শতপত্রে ভুবন উজ্জ্বলরূপে ভরে গেল। জলের প্রবাহ আপন তীর্থে অর্থাৎ আপন সীমার মধ্যে স্থান পেল।

"শ্বেত শঙ্খের মতো শ্বেতশুভ্র কাশগুচ্ছে সরোবরের তীর শোভিত হল। প্রবহমান নির্মল নীরযুক্ত নদীতট বিহঙ্গম-পংক্তিতে শোভিত হল।

"কর্দমভারমুক্ত বিমল জলে প্রতিবিম্ব দেখা গেল। শরদের আগমনে ক্রৌঞ্চ শব্দ করতে লাগলো এবং সে-শব্দ আমার অসহনীয় বোধ হল। মরালের আগমন-গমনে আমি মৃত্যু-পথ যাত্রী হলাম।

"পথিক! জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন শীর্ণ হয়ে চলেছি। খদ্যোতের চমকের সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন অসহায় হয়ে পড়েছি। সারস সরস শব্দ করে। হে সারসি! আমার চিরজীর্ণ দুঃখকে কেন তুমি স্মরণ করিয়ে দাও?

"হে সারসি! নিষ্ঠুর করুণ শব্দ মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিচ্ছে। এ-শব্দ শুনে বিরহণী স্ত্রী গত-মহোৎসব বা উদাস হয়ে পড়ে। হে পথিক! এভাবে এক এক করে সারসীদের করুণ শব্দ শুনে শুনে আমি ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য রাখতে পারছিনা।

"যে রমণীর কান্ত সঙ্গে রয়েছে সে-স্ত্রী বিবিধ আভরণে এবং চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রে শরীরে শৃঙ্গার করে পথে পথে রাত্রে খেলা করে ঘুরে বেড়ায়।

"ললাটকে উজ্জ্বল তিলকে চিত্রিত করে, শরীরকে কুঙ্কুম চন্দনে চর্চিত করে, হাতে সোরস্তক বা ক্রীড়াপাত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরে আনন্দিত রমণীরা দিব্য মনোহর গীত গেয়ে গোশালা এবং তুরঙ্গশালায় ধূপ দেয়। তাদেরে দেখে আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। তাদের ক্রীড়া আমি সহ্য করতে পারছিনা এবং আমার প্রিয় বিষয়ক ইচ্ছা বধিত হয়েছে।

"এ-সব চিত্র-বিচিত্র রমণী যখন আরও বেশী চোখে পড়ছে তখন আমি যেন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। মনে বিরহের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে। আমি নন্দিনী গাথা এবং ভ্রমরাবলী পাঠ করলাম।[৩৪]

"নব কমলদণ্ড খেয়ে যার কণ্ঠ শুদ্ধ হয়েছে সেই হংস এবং চক্রবাক জলে ভ্রমণ করে মধুর শব্দ করছে। তাদের শব্দে শরদশ্রী নূপুরের ক্ষীণ ধ্বনির মতো প্রতীত হচ্ছে যা শরদশ্রীর ভাঁতিকে চমৎকার শোভা প্রদান করছে।

"আশ্বিন মাসে পানির স্খলনবেগে বেগবান নদীতে সারসের শব্দ দুঃখে আমাকে অশ্রুসিক্ত করেছে।

"রাত্রিতে শশি জ্যোৎস্নায় ধবলগৃহকে সুশোভিত করেছে এবং তুঙ্গ প্রাকারকে অমল মনোহর করেছে। আমি রতিতে বঞ্চিত, প্রিয়শূন্য শয্যায় লুণ্ঠিত হয়ে যমরাজের প্রহার-সদৃশ ঘাতক শরদের রাত্রি কাটাই।

"কান্ত-সহচরী হয়ে যে সমস্ত রমণীরা ভ্রমণ করছে, সে সমস্ত রমণীর কারণে সরোবর তট শোভিত হয়েছে। বালক এবং যুবকেরা খেলা করছে। ঘরে-ঘরে পটহা বা দুন্দভি বাজছে শুনছি।

"রমণীরা কুণ্ডলাকারে নৃত্য করছে এবং সুন্দর বাদ্য বাজিয়ে গলিতে গলিতে ঘুরছে। তরুণীজনেরা শয্যাকে শোভিত রাখছে। গৃহসারির রেখা সুন্দর দেখাচ্ছে।

"দীপাবলীতে রাত্রিতে রমণীকুল দীপদান করে। তারা তাদের হাতে নবশশি-রেখার মতো দীপ বহন করে। সুন্দর দীপকে গৃহ মণ্ডিত হয়। রমণীরা তাদের চোখে অঞ্জন লাগায়।

"স্ত্রীরা বিবিধ ভঙ্গিমায় কৃষ্ণবস্ত্রে শোভিত। সে-সব বস্ত্রে উজ্জ্বল কুটিল রেখাঙ্কন লক্ষ্যগোচর হয়। তাদের চক্রাবর্ত পয়োধর এবং মনোহর হৃদয়-প্রদেশ মৃগনাভিতে চর্চিত।

"তাদের অঙ্গে কর্পূরের সঘন প্রলেপ যেন কন্দর্প তার শরের সাহায্যে শরীরে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। শিরোদেশ পুষ্পসজ্জিত যেন কালো বাদলের মধ্যে চন্দ্রমার অবস্থিতি।

"কর্পূর-বহুল পান চর্বন করে তাদের মুখ রক্তিম হয়েছে যেন প্রত্যূষে সূর্যের উদয় হল। অতিশীঘ্র সম্পাদিত প্রসাধনান্তর শয্যাসনে আসীন রমণীকুলের কিঙ্কিনি সুন্দর শব্দ করছে।

"কোথাও কোনও পুণ্যবতী যখন কেলিতে নিমগ্ন, তখন আমি উদ্বিগ্নতায় রাত্রিজাগরণে সময় কাটাচ্ছি। গৃহে গৃহে রমণীয় গীতধ্বনি হচ্ছে, অন্যপক্ষে সমস্ত দুঃখ যেন এক-মাত্র আমার।

"হে পথিক! তবুও আমি বহুদিন প্রবাসী প্রিয়ের স্মরণ করছি এবং পুনঃ প্রতিদিনের মতই সূর্যোদয় হয়েছে জেনে নয়নে অশ্রু প্রবাহিত করে 'অড়িল্লা' এবং 'বস্তক' পাঠ করলাম।

"রাত্রিতে অর্ধ প্রহরও নিদ্রা আসেনা। প্রিয়-সম্পর্কিত চিন্তায় লীন হয়ে থাকলেও আনন্দ পাইনা, অর্ধ নিমেষও শান্তি পাইনা। কামতপ্তা আমি মদনের বানে কি বিদীর্ণ হচ্ছিনা?

"হে পথিক! সে দেশে চন্দ্রের জোৎস্নায় রাত্রি কি নির্মল রূপে প্রস্ফুটিত হয়না? সে দেশে কমলের ফল আস্বাদনকারী রাজহংস কি কলকল শব্দ করেনা? অথবা কেউ কি সুললিত রাগে প্রাকৃত পাঠ করেনা? অথবা কোকিল পঞ্চম স্বরে কূজন করেনা? প্রাতঃকালে শিশিরসিক্ত পুষ্প কি পরিমলের স্পর্শ পায়না? হে পথিক! আমার তো মনে হয় প্রিয়তম নীরস হয়ে পড়েছে কেননা সে শরৎ কালেও গৃহের কথা স্মরণ করছেনা?"

হেমন্ত বর্ণন

"সুরহি গন্ধু রমণাউ সরউ ইন বোলিয়উ'—সুরভিগন্ধে রমণীয় শরদ এভাবেই অতি-ক্রান্ত হল। অতি ধৃষ্ট, খল প্রবাসী গৃহের স্মরণ করলোনা। এভাবে কামদেবের বাণে প্রতিভিন্ন আমি তুষারের ভারে শ্বেত ধবল গৃহকে দেখলাম।

"হে পথিক! বিরহাগ্নিতে সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌লো। কন্দপ দর্পপূর্বক ধনুক আকর্ষণ করে বাণ ছুড়তে লাগলো। আমার মত দুঃখার্তার শয্যার নিকট সে-চিত্তহর এলোনা। পরদেশে সে কাপালিক, খল, শবর ঘুরতেই লাগলো। আমার মতো উৎ-কণ্ঠিতা, দিশাহীন এবং অচৈতন্যাকে দেখতে দেখতে হেমন্ত তুষার ভাবের উপায়ন নিয়ে এসে উপস্থিত হল। পথিক! এ-ভুবনে শীতল জলের অনাদর হয়েছে। শয্যা থেকে

সকল কমলদল সরিয়ে দেওয়া হল। সৈরন্ধ্রিরা কর্পূর এবং চন্দন পিশছেনা। অধর এবং কপোলের অলঙ্করণের মধ্যে মদনের সংমিশ্রণ দেখা যাচেছ। চন্দন-রহিত কুঙ্কুমের প্রলেপ লাগানো হচেছ শরীরে। কস্তূরীযুক্ত চম্পার তেল তারা সেবন করছে।

''জাতীফলের সঙ্গে কর্পূরের প্রলেপন এখন আর হয়না। সুপারী কেতকী পুষ্পসার দিয়ে সুবাসিত করা হয়না। কামিনীরা ভবনের উপরিভাগ ছেড়ে রাত্রিতে আচ্ছাদিত স্থানে পালঙ্কে শয্যা পেতে শয়ন করছে।

''অগরু সুগন্ধ জ্বালানো হচেছ, শরীরে কুঙ্কুমের প্রলেপ সুখদ লাগছে। প্রগাঢ় আলিঙ্গন আনন্দদায়ক হয়েছে। অন্য ঋতুর দিনের তুলনায় হেমন্তকালীন দিন অনেক সংক্ষিপ্ত কিন্তু আমার মতো একাকিনীর জন্য এ-দিনই ব্রহ্মযুগের সমতুল্য বলে মনে হয়।

''হে পথিক! গৃহে একাকিনী আমি রাত্রিতে নিদ্রা না আসার কারণে বিলাপ করতে করতে একটি দীর্ঘ 'বস্তক' পাঠ করলাম।

''হে নিরক্ষর। দীর্ঘ উষ্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হল। হে তস্কর! হে নির্দয়! তোমার স্মরণে রাত্রিতে নিদ্রা এলোনা। হে ধৃষ্ঠ! আমার অঙ্গ তোমার করস্পর্শ না পাবার কারণে হেমন্তের প্রভাবে হেমের মতো শুষ্ক হয়েছে। হে কান্ত! এ-প্রকার হেমন্তকালে বিলাপকারিণী আমাকে যদি ধৈর্য না দাও, তা হলে হে মূর্খ! খল! পাপী! আমাকে মৃত জেনে প্রত্যাবর্তন করে তোমার লাভ কি?''

শিশির বর্ণন

''হে পথিক! এ-ভাবে কষ্ট সহ্য করে আমি হেমন্ত ঋতু পার করলাম। তদনন্তর শিশির ঋতুর আগমন হল। ধূর্ত নাথ আমার প্রিয়তম দূরেই রইলো। প্রখর কঠোর পবন কর্তৃক আহত হয়ে আকাশ বাত্যাবিক্ষুব্ধ হল। তার প্রভাবে বৃক্ষপত্র ঝরে পড়তে লাগলো।

''ছায়া, পুষ্প এবং ফলরহিত বৃক্ষ পক্ষীকুল কর্তৃক অসেবিত রয়ে গেছে অর্থাৎ শুকনো গাছে আর পাখী বসছেনা। চতুর্দিক কুহর তথা অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়েছে। পথিকের জন্য পথ বন্ধ হয়েছে, শীতের ভয়ে তারা যাত্রা করতে পারছে না। উদ্যানের মধ্যে অশোষিত কুসুমবনও জীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

''আপন কান্তকে কেলিগৃহ ছেড়ে তরুণীরা শিশিরের ভয়ে অগ্নিগৃহে অগ্নির শরণ নিয়েছে। কেলিরসের উপভোগের জন্য ভবনমধ্যে আচ্ছাদিত স্থানে রমণীকূল ক্রীড়ার আনন্দ গ্রহণ করছে। কেউ উদ্যানে বৃক্ষতলে শয়ন করছেনা।

''রসিকজন অধিক গন্ধযুক্ত অনেক প্রকার সুগন্ধিত রস পান করছে। বর-প্রার্থিনী পীনোন্নতস্তনা কোনও কোনও সীমন্তিনী কুন্দ-চতুর্থীতে শয্যায় শায়িতা রয়েছে।

''কেউবা ঋতুনাথের জন্মদিবসে দান করছে, আপন প্রিয়ের সঙ্গে কেলি উপভোগের জন্য শয্যাসনে যাচেছ। পথিক! এ-মুহূর্তে শয্যায় একাকিনী প্রেমমুগ্ধা আমি প্রিয়ের নিকটে আমার মনকে দূত করে পাঠাচ্ছি।

"আমি ভেবেছিলাম আমার মন প্রিয়কে নিয়ে এসে আমাকে সন্তোষ দেবে। কিন্তু জানতামনা যে, সে খল ধৃষ্ট আমাকে ছেড়ে যাবে। প্রিয়তো এলোইনা, উপরন্তু আমার মন-রূপ দূতকেও আটকে রাখলো। আমার সম্পূর্ণ হৃদয় দুঃখভারে পরিপূর্ণ হল।

"প্রিয় সমাগমের ইচ্ছা করতে করতে আমি আমার মূল সত্তাকেও হারিয়ে ফেলেছি। বিলাপ করতে করতে যে 'বস্তক' আমি পাঠ করেছিলাম, হে পথিক! তা' তোমাকে শুনাচ্ছি।

"আমি আমার ঘনীভূত দুঃখকে জেনেই আপন মনকে প্রিয়ের সমীপে প্রেরণ করেছিলাম। প্রিয়তো এলোইনা, মনও সেখানে রয়ে গেল। শূন্যহৃদয়া আমি ভ্রমণ করতে করতে রাত পার করলাম। অনির্দ্দিষ্ট কার্য করলাম, তাই পশ্চাত্তাপ হল। আমি হৃদয় দিলাম কিন্তু প্রিয়কে পেলামনা। বলত, এটা কেমন উপমা হল? যেন গর্দভী শৃঙ্গের জন্য গিয়ে দুটো কানই হারিয়ে এসেছে!

বসন্ত বর্ণন

"এভাবে বন-তৃণকে জ্বালিয়ে শিশির চলে গেল এবং মনোহর মধুমাস এলো। বিরহীর মদনাগ্নিকে বিস্ফুরিত করে মলয়গিরির সমীর নিরন্তর প্রবাহিত হতে লাগলো।

"বসন্ত একই সঙ্গে সঙ্কোচ এবং সুখকে প্রকাশ করে। দশদিকে রমণীয়তা বিকশিত হচ্ছে। নবীন কুসুমপত্র বিবিধ বেশ ধারণ করছে। নব নব পুষ্প এবং পত্র অনেক বেশে দেখা দিচ্ছে। রতি-বিশেষে নব সরোবর অত্যন্ত শোভাযুক্ত হয়েছে।

"অত্যন্ত মনোহর বিবিধ রাগে এবং শ্বেত সর্বরক্ত পুষ্প ও বস্ত্রে শরীরকে সাজিয়ে স্ত্রীরা আপন সখিদের সঙ্গে নিত্য গীত গাইছে।

"অনেক গন্ধামোদে তাদের অঙ্গ মোহিত। যেন সূর্য (অথবা তরুণীরা) শিশিরের শোক ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ শীতের কষ্ট থেকে তাদের মুক্তি ঘটেছে)। এ-দেখে প্রিয় সখিদের মধ্যে আমি 'লঙ্কোড়ক' পড়লাম।[৩৫]

"অতি দুঃসহ গ্রীষ্ম গেল, উদ্বিগ্নতাপূর্বক বর্ষা অতিক্রান্ত হল, অতি কষ্টে শরদ কাটলো। হেমন্ত এলো, পরূষ শিশিরকালে আমি ক্রন্দন করে কোনও ভাবে কাটালাম। নাথকে স্মরণ করে এ-বসন্তকাল কাটানো আমার পক্ষে দুষ্কর হবে।

"তরুবর আপন নব কিশলয়রূপী হাত দিয়ে বসন্তলক্ষ্মীকে স্বাগত জানাচ্ছে। প্রত্যেক বনে কেতকীর মধু এবং গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর গুঞ্জন করছে।

"কেতকীর ঘন কাঁটায় বিদ্ধ হয়েও ভ্রমর মধুর রসাস্বাদনে বিরত থাকছেনা, তীক্ষ্ণ কণ্টকাগ্রেও সে কষ্ট অনুভব করছেনা। রসিকজন রসের লোভে শরীর পাত করে, প্রেমের মোহে মানুষ পাপকে গণনা করেনা।

"পথিক! মধুমাস দেখে আমার মনে বিস্ময় জেগেছে। এ-বিস্ময়কে যে রমণীয় ছন্দে প্রকাশ করেছি তা শুন।

"প্রজ্জ্বলন্ত বিরহাগ্নির তীব্র জ্বালায় কামদেবও গর্জন করতে করতে ব্যাকুল হয়েছে। দুস্তর, দুঃসহ বিয়োগ সহ্য করে ভয়ভীত হয়ে আমি কোনও প্রকার বেঁচে আছি। আমার চিন্তা এ-কারণে যে আমার স্নেহ দ্বারা ক্ষণকালও পীড়িত না হয়ে আমার প্রিয়তম স্তম্ভতীর্থে নির্ভয়ে বাণিজ্য করছে।

"কিংশুকের উপর কৃষ্ণবর্ণ রক্তের বর্ষা যেন নেমেছে। পলাশ নিশ্চিতই প্রত্যক্ষ পলাশ অর্থাৎ মাংসাহারী হয়েছে। প্রভঞ্জনের কারণে সব কিছু দুঃসহ হয়েছে। সুখদায়ক অঞ্জন কষ্টদায়ক হয়েছে।

"নিরন্তন পুষ্পপরাগ ঝরে পড়ছে বলে ধরিত্রী লাল এবং অধিকতর তপ্ত হয়েছে। পৃথিবীকে শীতল করতে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা শীত উৎপন্ন করছেনা. অন্যপক্ষে সে তাপ ছড়াচ্ছে।

"লোকমধ্যে যে বৃক্ষ অশোক নামে প্রসিদ্ধ সে-নাম মিথ্যা, কেননা সে অর্ধক্ষণের জনও আমার শোক হরণ করিতে পারেনা। কন্দর্প দর্পপূর্বক অঙ্গকে সন্তপ্ত করেছে, সহকার অঙ্গকে আশ্রয় দেয়না।

"হে পথিক! ছিদ্র বা অবসর পেয়ে বিরহ আরও ভয়ঙ্কর রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। ময়ূর তাণ্ডব নৃত্য করে তার মর্মভেদী শব্দ শুনাচ্ছে এবং মাকন্দ বৃক্ষের শাখায় তাকে দেখা যাচ্ছে। হে পথিক! যে 'গাথা' আমি তখন পড়েছিলাম তা তোমাকে শুনাচ্ছি।

"হে দূত! নাট্যবর্হে ময়ূর-ময়ূরীর হর্ষ দেখে আমি বেদনার্ত হয়েছি। গগনে প্রসারিত নবদ্রুমমালা-সদৃশ মেঘমালার ভাঁতি দেখে আমি দুঃখিত হয়েছি।"

এ-গাথা পাঠ করে দুঃখকে মনে ধারণ করে বিরহাগ্নির জ্বালায় প্রজ্জ্বলিত, কামবাণে জর্জরিত রমণী ক্রন্দন করে উঠলো।

"এ-বসন্ত ঋতুর এক একটি ক্ষণ যমের কালপাশের মতো দুঃসহ মনে হচ্ছে। সুন্দর পুষ্পশোভায় দশদিক সুশোভিত রয়েছে। আকাশে আম্রবৃক্ষ ঘনরূপে বিকশিত রয়েছে। নবমঞ্জরীতে আকাশেও বসন্ত জেগেছে।

"সুরক্ষক বৃক্ষের উচচ শাখায় কৃষ্ণকায়া কোকিল বিবিধভাবে ভরতমুনী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে গান গেয়ে চলেছে। অত্যন্ত মনোহর ঋতু এসেছে, মধুকর সরস ধ্বনি করছে।

"বসন্তকালের কীর বা তোতা আকাশে মণ্ডলাকারে উড়ে করুণাযুক্ত ধ্বনি করছে। একটি কোমল সময়ে মদনের বশ হয়ে কষ্টপূর্বক জীবন ধারণ করছে।

"জলরহিত মেঘ শরীরকে আরও সন্তপ্ত করছে। আমি এ-সময়ে কোয়েলের কলরব কি করে সহ্য করবো ? রমণীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চতুর্দিকে তূর্যধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে।

"ঘন নিবিড় হার পরিধান করে নানাপ্রকার আঙ্গিক কৌশলে স্ত্রীরা তাল রেখে চর্চরী গীতধ্বনির সঙ্গে অপূর্ব বসন্তকালীন নৃত্য করছে। স্ত্রীদের মেখলার কিঙ্কিণীর রুনুঝুনু শব্দ শুনা যাচ্ছে।"

নবযৌবনা তরুণীরা গান গাচ্ছে। তাদের গীত শুনে প্রিয়োৎকণ্ঠিতা এই গাথা পড়লো।

"এ-সময় যখন লোকেরা রভসানন্দে সময় কাটাচ্ছে আমার হৃদয়ে কন্দর্প অত্যধিক তীব্র বাণ বিদ্ধ করেছে।

"পথিক! আমি সঘন দুঃখে উদ্বিগ্ন এবং বিরহের মদনাগ্নিতে পীড়িত। আমি উক্ত অনক্ষরের প্রতি যা কিছু বলেছি তার কঠিনতাগুলোকে ত্যাগ করে বিনয়ের সঙ্গে যা শোভন হয় তাই তাকে বলবে। এভাবে বলবে যাতে প্রিয়তম কোপ না করে। যা উপযুক্ত তাই বলবে।" একথা বলে কামিনী আশীষ দিয়ে পথিককে বিদায় দিল।

পথিককে বিদায় দিয়ে দীর্ঘাক্ষী অতিবেগে চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিকে মোড় ঘুরতেই সে তার পতির দর্শন পেলো। কামিনী তুরন্ত হর্ষিত হোল। যেভাবে অর্ধক্ষণে তার কার্যের অচিন্তিত মহতী সিদ্ধি হলো, ঠিক সেভাবেই শ্রোতা ও পাঠকেরও কার্য সিদ্ধি হলো। অনাদি অনন্তের[৩৬] জয় হোক।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

১ "রাস, রাসক, রাসো ঔর 'রাসা' শব্দোঁসে অভিহিত সাহিত্যকে বিকাশকা অধ্যয়ন অত্যন্ত রোচক ঔর মহত্বপূর্ণ হৈ।"—হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী: আবদুল রহমান-কৃত সন্দেশ রাসক: হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর (প্রাইবেট) লিমিটেড, বম্বঈ—৪, পৃষ্ঠা ৫৯। নরোত্তম স্বামী নামক একজন পণ্ডিতের ধারণা মতে 'বীররস প্রধান কাব্য হচ্ছে 'রাসো' এবং বীররসেতর কাব্য হচ্ছে 'রাস'। (দশরথ ওঝা: 'রাস কা কাব্যপ্রচার': রাস ঔর রাসানুয়ী কাব্য, কাশীনাগরী প্রচারিণী সভা, সংবত্ ২০১৬ বি.)।

২ হরিবংশপুরাণের বিষ্ণুপর্বের বিংশ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পাওয়া যায়:

"এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥

সংস্কৃত টীকায় 'চক্রবালৈঃ'-এর অর্থ করা হয়েছে 'রাসক্রীড়া'।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশে 'রাসগোষ্ঠী' এবং 'রাসমণ্ডলম্' শব্দ দুটি সুস্পষ্টভাবে আছে।

৩ ডি. আর. মাণকদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর আলোচনায় পাওয়া যায়, পৃষ্ঠা ৬০। (উপরের ১ সংখ্যক উল্লেখ)

ভাসের নাটকে 'হল্লীসক নৃত্যবন্ধ' কথাটি আছে।

৪ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশতি অধ্যায়ে একাধিক বার 'রাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৫ 'কর্পূরমঞ্জরী' দশম শতকের রচনা।

৬ "We now come to the fourth scene plate D, consisting of a double group of female musicians. The left hand group comprises seven women standing around on eighth figure, evidently a dancer. The next three musicians are each engaged in beating a pair of wooden sticks called danda in Hindi and tripri in Marathi—*Painting* by Dr. J. Ph. Vogel, p. 50. (হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা. ৬২)।

৭ 'রাসোকা অর্থকা ক্রমিক বিকাশ': সাহিত্য সন্দেশ, ডক্টর দশরথ শর্মা, জুলাই ১৯৪১।

৮ 'সমং সসীমা সমবাহু হত্থা রেহাবিসুদ্ধা অবরাউদেন্তি।

পংতীহিং দোহিং লঅতালবন্ধং পরীপ্পরং সাহিমুহী হুতান্তি॥ কর্পূরমঞ্জরী ৪/১১

৯ হেমচন্দ্র তাঁর 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে লিখেছেন :
"গেয়ং তোম্বিকা ভাণ প্রস্থান শিংগকভাণিকা প্রেরণ রামাক্রীড় হল্লিসকরাসক গোষ্ঠী শ্রীগদিত রাগ কাব্যাদি।"

১০ চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১১ অর্থ : 'পশ্চিম দিশায় প্রাচীন কাল থেকে প্রসিদ্ধ ম্লেচ্ছ নামক এক প্রধান দেশ ছিলো। সেখানে মীরসেন নামক এক আরব্ধ তন্তুবায়ের জন্ম হল। উক্ত মীরসেনের কুলে কমল সদৃশ আবদুল রহমান নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হল যে ছিল প্রাকৃত কাব্য এবং গানে অত্যন্ত নিপুণ। সে সন্দেশরাসক নামক শাস্ত্রের রচনা করলো।'

১২ ১-সংখ্যক উল্লেখ। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর প্রস্তাবনায় আলোচিত।

১৩ হিন্দী কাব্য ধারা : রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কিতাবমহল প্রকাশন, ইলাহাবাদ।

১৪ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর গৃহীত পাঠ। রাহুল সাংকৃত্যায়নে পাঠটি কিছুটা অন্য রকম :

"অণুরাইয়রয়িহরু কামিয়-মণহরু,
ময়ণ মণহ-পহ-দীবয়রো।
বিরহিণি মইরদ্ধউ সুণহু বিসুদ্ধউ,
রসিয়হ রস-সঞ্জীবয়রো॥"

১৫ 'সন্দেশরাসকে'র ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দশরথ ওঝা 'জনভাষা কা স্বরূপ ঔর রাস' নামক প্রবন্ধে। (রাস ঔর রাসান্বয়ী কাব্য' : নাগরী প্রচারিণী সভা, বারাণসা, পৃষ্ঠা. ১১১-১৪১)।

১৬ শব্দশাস্ত্রের অর্থ এখানে অর্থসহিত শব্দ।

১৭ মূলে আছে 'করড়ি' যার অর্থ করট বা ঢোল।

১৮ এখানে ইন্দ্রের ঐরাবতের কথা বলা হয়েছে বলে কোনও কোনও টীকাকার মন্তব্য করেছেন।

১৯ মূলে আছে 'তুম্বিণী' অর্থাৎ লতানো লাউ গাছ।

২০ চতুর্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা।

২১ 'মণুয়জন্মি কোলিয় পয়াসিউ।' অর্থাৎ মনুষ্যলোকে কৌলিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

২২ 'কুসুমসর-উহ-রূপণিহি বিহি নিম্মবিয় গরিট্ঠ।' অর্থাৎ কামদেবের সাক্ষাৎ অস্ত্রের সমান, রূপের নিধি এবং স্রষ্টার উৎকৃষ্ট কৃতি।

২৩ এ উপমহাদেশে প্রেমের জন্য যাঁরা সর্বস্বত্যাগী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সুদৈবচ্চ, ভর্তৃহরি, নল এবং এ-রকম আরও অনেককে নিয়ে প্রচুর কাহিনী-কাব্য অপভ্রংশ এবং অবঠি ভাষায় রচিত হয়েছে।

২৪ 'ভমইজুয়ল সন্নদ্ধউ'।

২৫ বনস্পতির নাম কাহিনীসূত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। কয়েক'টি নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত, যেমন দল্ল, খতঙ্গ, নিম্বোয়, খট্টণ।

২৬ গাহা বা গাথা এক প্রকার প্রাকৃত ছন্দের নাম। অপভ্রংশেও এ-ছন্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যতির দৃষ্টিতে গাহার দুটি ভেদ পাওয়া যায়—মুখবিপুলা এবং জঘনবিপুলা। হিন্দীতেও এ-ছন্দের প্রয়োগ আছে। দোহা অপভ্রংশ ছন্দ। এর দুটি পদ, প্রতিপদে ২৪ মাত্রা। হিন্দীতে দোহার প্রচুর ব্যবহার ঘটেছে। বত্থু অথবা ছপ্পয় বীরগাথাকাব্যে প্রচুর ব্যবহার হয়েছে, তুলসীদাস যুদ্ধ বর্ণনায় এ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ডোমিলয় অথবা ডোমিল্ল ছন্দকে প্রাকৃতপৈঙ্গলে একই সঙ্গে মাত্রাবৃত্ত এবং বর্ণবৃত্ত হিসেবে গণনা করা হয়েছে। এ-ছন্দ ৩২ মাত্রার, মাত্রার ক্রম হচ্ছে ১০+৮+১৪।

২৭ প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'মালিনী' ছন্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর প্রথমে দুই রস (৩ মাত্রা), পরে তিন চমর (গুরু), পরে এক শর (লঘু) দুই গুরু। পরে এক গন্ধ (লঘু) এবং দুই কর্ণ (গুরু) হয়ে থাকে, যেমন :

"বহই মলঅ বাআ, হন্ত কম্পন্ত কাআ
হণই সবণ রন্ধা কোইলা লাব বন্ধা।
সুণিঅ দহ দিহাসুং ভিঙ্গ ঝংকার ভারা
হণিঅ হণই হঞ্জে ঢণ্ড চণ্ডাল মারা।"

২৮ অড়িল্ল বা অড়িল্লা ছন্দ যমকান্ত—অর্থাৎ এর চার পদের অন্তিম শব্দে যমক হয়ে থাকে। প্রত্যেক পদে ১৬ মাত্রা হয়, অন্তিম দুমাত্রা লঘু হয়।

২৯ ফুল্লয় বা ফুল্লক ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না, কেবল 'বৃত্তজাতিসমুচ্চয়' গ্রন্থে 'উফ্‌ফুল্লক' নামক এক ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩০ মড়িল্ল বা মড়িলা, অড়িল্ল ছন্দেরই কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ। চূড়িল্লয় বা চূড়িল্ল একটি প্রাচীন ছন্দ যার উদাহরণ 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' পাওয়া যায়।

৩১ খড়হড়ক বা খড়হড়য় ছন্দ ভ্রমরাবলী এবং গাহার মিলনে উৎপন্ন হয়।

৩২ প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ছন্দশাস্ত্রে এ-ছন্দের কোনও উল্লেখ নেই।

৩৩ 'বস্তক' এবং 'দোধক' ছন্দের কোনও বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না।

৩৪ 'নন্দিনি' তোটক ছন্দের একটি অন্য নাম। 'ভমরাবলী'ও তোটক ছন্দের প্রকার ভেদ মাত্র।

৩৫ একটি ছন্দের নাম।

৩৬ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'অনাদি অনন্তে'র ব্যাখ্যা করেছেন 'কেয়ামতের দিন' বলে। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন 'অনাদি অনন্ত পরম পুরুষ' বলে। মূলে আছে—'অণাই অণন্তু'। দ্বিবেদীর ভাষায়, 'অনাগত অন্ত কা অর্থ হৈ কয়ামতকা দিন। য়হ পাঠ কবিকো নিশ্চিত রূপমে মুস্লিম ধর্মানুযায়ী সিদ্ধ করতা হৈ।' (পৃষ্ঠা ৫৮: দ্বিবেদী সম্পাদিত 'সন্দেশ-রাসক'।)